ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০০৫

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ এর ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

ইসলামী আইন ও বিচার

ISSN 1813 - 0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

ইসলামিক ল' রিচার্স সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

প্রকাশনায়		ইসলামিক ল' রিচার্স সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ-এর পক্ষে এডভোকেট মোহম্মদ নজরুল ইসলাম
প্রকাশকাল		অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০০৫
যোগাযোগ	:	এস এম আবদুল্লাহ ইসলামিক ল' রিচার্স সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ পিসি কালচার ভবন (৪র্থ তলা) ১৪ শ্যামলী, শ্যামলী বাসস্ট্যান্ড, ঢাকা-১২০৭ ফোন : ৯১৩১৭০৫, মোবাইল : ০১৭২ ৮২৭২৭৬ E-mail : ilrclab@yahoo.com
প্রচ্ছদ	:	মোমিন উদ্দীন খালেদ
মুদ্রণে	:	আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
দাম	:	৩৫ টাকা US $ 3

Published by Advocate MUHAMMAD NAZRUL ISLAM, General Secretary, Islamic Law Research Centre and Legal Aid Bangladesh. Pisciculture Bhaban (3rd Floor) 14 Shymoli, Shymoli Bus Stand, Dhaka-1207,Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Moghbazar, Dhaka, Price Tk. 35 US $ 3

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

ইসলাম কায়েমের জন্য আত্মঘাতী বোমাবাজি ও গণহত্যা

একুশ শতক গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার যুগ। কিন্তু আইন ও নিয়মতান্ত্রিকতার যুগও। ইচ্ছামতো যে কোনো কাজ মানুষ যে কেউ করতে পারে কিন্তু সেটাও একটা নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে থেকে। মানুষ সবচেয়ে বেশি বা চূড়ান্ত পর্যায়ে কি করতে পারে? নিজেকে হত্যা করতে পারে। কিন্তু এরপর তো তার আর কিছুই করার থাকে না। সে জানে না তার এই কাজের ফল কি হলো। কাজেই সে নিশ্চিতভাবে ব্যর্থ হলো। সে কি ভাবলো, কি ভাবতে পারলো। ভাবাভাবির জগত থেকে অনেক অনেক দূরে সরে গিয়েছে সে। যখন সে একজন মুসলিম হয় তার জন্য এ কথা একশোভাগ সত্য। আর যদি অমুসলিম হয় তাহলে তার আগের ও পরের মধ্যে কোনো তফাত নেই। দুটোই সমান তার কাছে।

এখন এই আত্মহত্যা, আত্মহনন, আত্মাহুতি, আত্মবিসর্জন ও আত্মঘাত এ সবকিছুর আগে নিশ্চয়ই তারা আরো অনেক নীতি ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। ধরুন সন্ত্রাস, গণহত্যা, বোমাবাজি এবং আরো অনেক কিছু। আমরা এগুলোর পেছনে তাদের ব্যক্তি, দলীয় ও জাতীয় স্বার্থপরতার চাইতে আন্তরিকতাকে প্রাধান্য দিলাম। তারা আন্তরিকভাবে এগুলো করতে চেয়েছে এবং করেছে। তারপরও তারা তাদের লক্ষে পৌঁছাতে পারেনি। তারা মনে করেছে তারা ব্যর্থ হয়েছে। তাই শেষমেষ নেমে এসেছে একেবারে নিচে। অথবা তারা দেখেছে দুনিয়ায় জুলুম, শোষণ, নিপীড়ন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ওগুলো কোনো কাজে আসছে না। তাই একেবারে চরম পথেই নেমে এসেছে। এ কথাগুলো তো বললাম স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে যখন তারা চিন্তা ও কর্ম ধারার প্রসার ঘটায়। কিন্তু এমনও তো হতে পারে এবং এর সম্ভাবনাও একশোভাগের কম হবার সম্ভাবনাও অনেক সময় কমই থাকে। যাকে আমরা এক কথায় বিভ্রান্তি প্রতারণা ও প্রলোভন বলি। কারণ মানুষ তো ভুলের সমষ্টি। এমনকি কুরআন থেকে সত্য আহরণ করার জন্যও তাকে পূর্বাহ্নে শয়তানের প্ররোচণা থেকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শরণ নিতে হয়। এ কথা আল্লাহ নিজেই কুরআনে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন : যখন তোমরা কুরআন অধ্যয়ন করবে, আগে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

আর এ জন্য আত্মহনন ও আত্মঘাতকে ইসলামে কোনো মর্যাদা দেয়া হয়নি। বরং যে মানুষ এভাবে নিজেকে বিনাশ করে আল্লাহ তার প্রতি নারাজি প্রকাশ করেছেন। সূরা নিসার ২৯ আয়াতে বলেছেন, 'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না।' মানুষের প্রাণ তো মানুষের নিজের নয়, আল্লাহর দেয়া। কাজেই তাকে হনন করার অধিকার মানুষের নেই। যে এ ধরনের কাজ করে সে আসলে নিজেকে আল্লাহ মনে করে। এটা এক ধরনের শিরক। তাই তার জন্য জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নির্ধারিত নেই। আল্লাহ বলেন, শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলুম ও গুনাহ। আর আল্লাহ সব গুনাহ মাফ করবেন কিন্তু শিরকের গুনাহ মাফ করবেন না। কাজেই আত্মঘাতী বোমাবাজদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত।

এরপর আসুন আমরা চিন্তা করি এই আত্মঘাত কেন? একজন সুস্থ-সবল বুদ্ধিমান মানুষ কেন এই চরম পন্থায় নেমে আসে? আসলে এটা একটা প্রতিবাদ। একটা যুদ্ধ কৌশল। অথবা বলা যায় প্রতিবাদী যুদ্ধ কৌশল। কখনো এতে সফলতা আসেও। যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই কৌশল অবলম্বন করে জাপানীরা মার্কিন বাহিনীকে বেশ ঘায়েল করতে পেরেছিল। ১৯৬৫ সালে পাক ভারত যুদ্ধেও লাহোর সেক্টরে পাকিস্তানী বাহিনী এই পদ্ধতি অবলম্বন করে ভারতীয় ট্যাংক বাহিনীর অগ্রযাত্রা রুখে দিয়েছিল। ব্যক্তিগত পর্যায়েও কোনো কোনো অমুসলিম দেশেও ইতিপূর্বে এ ধরনের প্রতিবাদী আত্মহননের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সেগুলো ছিল ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ। দাবী আদায়ের জন্য নিজেকে জনসমক্ষে পুড়িয়ে মারা। কিন্তু কোনো মুসলমান কখনো এ কাজ করেনি। কারণ তারা জানতো এটা নির্ঘাত জাহান্নামের পথ, জান্নাতের নয়।

তবে সম্প্রতিকালে বিশ্ব পরাশক্তি ও তার ইহুদি ব্রেন যে চরম সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের লালন করে চলেছে তাদের অমানবিক নির্যাতন, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার কোনো প্রকার অস্ত্র না পেয়ে নিরুপায় হয়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ফিলিস্তিন ও ইরাকের কিছু মুসলিম গ্রুপ এ ধরনের কিছু আত্মঘাতী বোমা হামলা চালাচ্ছে। কিন্তু সেগুলোর প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন যা বাংলাদেশে কিছুদিন থেকে ঘটছে তার থেকে।

এখানে তো আল্লাহর আইন কায়েমের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে জনতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র একটা গ্রুপ নব্বই শতাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনতার বিরুদ্ধে প্রথমে বোমাবাজির মাধ্যমে গণহত্যা চালিয়ে তারপর কিছু নিরীহ সরল বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে দারিদ্র্যপীড়িত অল্প বয়স্ক যুবককে যারা দীন ইসলামের তাৎপর্য সম্পর্কেই অজ্ঞ, আত্মঘাতী বোমা হামলার মাধ্যমে গণহত্যা চালিয়ে ও ভীতির সঞ্চার করে আল্লাহর আইন কায়েমের স্বপ্ন দেখিয়ে বেহেশতে যাওয়ার সহজ পথ বাতলে দিয়েছে। প্রথম দিকে এই সর্বনিম্ন স্তরের আত্মঘাতী বোমাবাজদের বিশ্বাসে ছিল প্রত্যয় এবং কণ্ঠস্বরে ছিল দৃঢ়তা। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এদের একটু উচ্চস্তরের বা একটু বেশি উচ্চস্তরের যেসব নেতা ধরা পড়ছে যারা আসলে ঐ বোমাবাজদের গাইড বা ছোটখাটো মুরশিদ পর্যায়ের

তাদের ঈমান দেখা যাচ্ছে টলটলায়মান। তারা দুনিয়ার দু'চারটে মারের পর আল্লাহর মারের ভয় ভুলে যাচ্ছে। মানে তারা নিজেদের ভুল স্বীকার করছে। অর্থাৎ সর্বনিম্নস্তরের মাঠ ময়দানের আত্মঘাতী বোমাবাজদের তুলনায় এরা ঘটনার ভেতরের আসল খবর কিছুটা জানে। এটা যে আল্লাহর আইন কায়েম করার জন্য করা হচ্ছে এ ব্যাপারে তারা সন্দিহান। আবার তাদের উচ্চস্তরের নেতাদের ঈমান আরো কম পোখ্‌তা। কারণ তারা আসল খবর মনে হয় আরো বেশি জানে। এটাকে তারা জিহাদ নাম দিয়েছে। তবে এখন জিহাদ হবার ব্যাপারে তাদের বিশ্বাসে চিড় ধরেছে। বিগত চার মাসের মধ্যে পরিস্থিতি অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। দেশের সকল উলামায়ে কেরাম যেখানে নিশ্‌ছিদ্র ঐকমত্যের ভিত্তিতে যে কাজটিকে জিহাদ বলছেন না বরং জাহান্নামের কাজ বলছেন তাকে এক দুজন ইসলামী পণ্ডিত কোন সাহসে ও যুক্তির ভিত্তিতে বেহেশতের পথ বলতে পারেন? তাদের ঐ জ্ঞানের ও পাণ্ডিত্যেরও মূল্যায়ন হওয়া দরকার। আসলে এ ধরনের ব্যতিক্রমী কাজ করার আগে তাদের এই মতবাদ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও বইপত্রের আকারে জনসমক্ষে আসা দরকার ছিল। আলোচনা ও সমালোচনার মাধ্যমে তারা একটা সমর্থক গ্রুপ ও ময়দান তৈরি করতে পারতেন। কিন্তু তা তারা করার প্রয়োজনবোধ করেননি। কারণ তারা জানতেন তাদের মতবাদ ভুল, অগ্রহণযোগ্য ও অবাস্তব। আসলে তারা ইসলাম ও কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রভাবিত বা পরিচালিত হননি। বরং প্রভাবিত ও পরিচালিত হয়েছেন বিশ শতকের বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফিতনা এবং অবাস্তব ও অমানবিক মতবাদ মার্কস এঙ্গেলসীয় মতবাদ দ্বারা। তবে কুরআন ও হাদীসকে তাদের মতবাদের সত্যতা প্রমাণের জন্য কেবল ব্যবহার করেছেন।

কার্ল মার্কসের এক মহান শাগরিদ আধুনিক মহাচীনের মহান জাতীয় নেতা মাও সে তুংয়ের তবুও তো এতটুকু সৎ সাহস ছিল যে তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতে পেরেছিলেন– বন্দুকের নলই সকল ক্ষমতার উৎস, জনগণ নয়। এ জন্য তিনি গণতান্ত্রিক বিশ্বে ভীষণভাবে সমালোচিত হয়েছিলেন। কিন্তু নিজের মতবাদ থেকে সরে দাঁড়াননি। তাঁর তুলনায় আমাদের দেশের এই দু-একজন পাণ্ডিত্যাভিমানী ইসলামী ব্যক্তিত্বের সেই সৎ সাহসটুকুও নেই। আধুনিক রাজনৈতিক পরিভাষায় গডফাদারদের মতোই তাদের অবস্থান। তাদের আওয়াজ শুনবেন কিন্তু চেহারা দেখবেন না।

সমস্ত পৃথিবীতে 'তাওহান ওয়া কারহান' ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আল্লাহর আইনই চলছে। বস্তুজগত, জীবজগত ও শূন্য জগত সবাই আল্লাহর আইনের অধীন। এমনকি এর মধ্যে একচুল ব্যতিক্রম করার ক্ষমতা কারোর নেই। একমাত্র মানুষ সামান্য ব্যতিক্রম। মানুষকে বিশেষ কারণে সীমিত পর্যায়ে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এজন্য যে সারা বিশ্ব জগতে স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায় আল্লাহর যে আইন সমগ্র সৃষ্টি মেনে চলছে এমনকি খোদ মানুষের দেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গও, মানুষ যেন তার সাথে সংগতি রেখে নিজের জন্য আইন তৈরি করে। তাহলে পৃথিবীতেও মানুষের মধ্যে শান্তি বিরাজ করবে। সে আইনের কথা এবং প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি আল্লাহ নিজেই কুরআনে বলে দিয়েছেন। আবার তাঁর রসূল

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে আইন কায়েম করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। সেখানে কোনো বোমাবাজি বা আত্মঘাতী বোমা হামলা করে মানুষ খুন করে মানুষবিহীন জমিনে আল্লাহর আইন কায়েমের ছবি দেখা যায় না। সেখানে দেখা যায় তিনি অত্যাচারিত হয়েছেন তবুও নিজের বক্তব্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। তাদেরকে বুঝিয়েছেন। যুক্তির সাহায্যে তাদেরকে পরাস্ত করেছেন। গায়ের জোরে, তলোয়ারের কোপ মেরে, বুকে তীর বা নেজা বিদ্ধ করে বলেননি আমার কথা মানতে হবে।

কুরআনের সূরা বাকারার ২৫৮ আয়াতে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লামের সাথে তাঁর সমকালীন ইরাকের বাদশাহ নমরুদের বিতর্কালাপ উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে : 'তুমি কি তার কথা ভেবে দেখোনি যে ইবরাহীমের সাথে তার প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, যেহেতু আল্লাহ তাকে শাসন কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন? যখন ইবরাহীম বললো, আমার প্রতিপালক হচ্ছেন তিনি যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে (বাদশাহ) বললো, আমিও তো জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই। ইবরাহীম বললো, ঠিক আছে তাই যদি হয় তাহলে (আমার) আল্লাহ তো সূর্য পূব দিক থেকে উঠান তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উঠাও। 'ফা বুহিতাল্লাযী কাফার।'–এ কথায় সেই সত্য অস্বীকারকারী হতবুদ্ধি হয়ে গেলো।'

হযরত ইবরাহীম আ. আল্লাহর নবী। আল্লাহ চাইলে তাঁর নবীকে বিশেষ ক্ষমতা দান করতে পারতেন। কারণ তিনিই সকল ক্ষমতার মালিক ও উৎস। আর ইবরাহীম আ. সেই ক্ষমতা বলে নমরুদকে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে বাধ্য করতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। কারণ বিশ্বাস বলা হোক, রাজত্ব বলা হোক সবই তো মনের ওপর। দেহ তো ভারবাহী ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই ইসলাম বা আল্লাহর আইন কায়েমের জন্য কুরআনে যুক্তির পথ অবলম্বন করা হয়েছে, শক্তির পথ নয়।

তাই আমাদের জিজ্ঞাসা, বাংলাদেশে আত্মঘাতী বোমাবাজদের প্রধান মুরশিদ মিঃ শায়খ আবদুর রহমান, আল্লাহর আইন কায়েম করার উদ্দেশ্যে এই আত্মঘাতী বোমাবাজির থিওরি এবং প্রাকটিসের জন্য আপনি কার সাথে কন্ট্রাক্ট করেছেন? দেশের ভেতরের, বাইরের, আন্তরজাতিক পর্যায়ের কার সাথে? তবে নিশ্চয়ই আল্লাহর সাথে নয়।

– আবদুল মান্নান তালিব

সুদ ও ঋণ : ইসলামী শরীয়াহ'র বিশ্লেষণ

ইমাম আবূ বকর আল জাস্‌সাস

সুদের আরবী প্রতিশব্দ রিবা। বাংলা অর্থ অতিরিক্ত, বর্ধিত, লাভ ইত্যাতি। এ থেকে রবিয়্যত বা রবুওয়ত শব্দের উৎপত্তি।

পারিভাষিক অর্থে সুদ দুই প্রকার

একটি প্রত্যক্ষ সুদ এবং অপরটি পরোক্ষ ও নির্দেশগত সুদ। প্রত্যক্ষ ও প্রকৃত সুদ হলো ঋণ দিয়ে বেশি গ্রহণ করা। যেমন হযরত উসামা বিন যায়েদ রা.-এর সূত্রে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে, 'রিবা বা সুদ শুধু বাকি দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।' তথা বাকী দিয়ে অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করাই হলো প্রকৃত ও আসল সুদ। পরোক্ষ বা নির্দেশগত সুদ হলো, বিশেষ কিছু দ্রব্যের পরস্পরের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় চলাকালে বেশি গ্রহণ করা। এটি পরোক্ষ সুদ, আসল নয়। হাদীসে এই সুদকে হারাম করার তাৎপর্য হলো মানুষের অন্তরকে সুদী মনোভাব থেকে মুক্ত করা। যেন ধীরে ধীরে আসল ও প্রকৃত সুদের পথে তারা এগুতে সাহস না করে। তাহলে সংক্ষেপে বলা যায় শরীয়তের পরিভাষায়, নির্দিষ্ট শর্তের আওতাধীন কিছু বিশেষ দ্রব্যের পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে পরিমাণগত তারতম্য কিংবা সোনা রূপা ও মুদ্রার ক্ষেত্রে ঋণস্বরূপ নগদ বাকী আদান প্রদানকালে সময়ের ব্যবধান জনিত তারতম্যের সুবাদে প্রদত্ত বা গৃহীত অতিরিক্তকে সুদ বলে। বলাবাহুল্য সুদের উল্লেখিত শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কার্যত এক নয়। বরং দু'টির মধ্যে বিস্তর ফারাক বিদ্যমান। সুদের শাব্দিক অর্থ তৎকালীন আরবী ভাষা ভাষী সকলের জানা থাকলেও তার পারিভাষিক অর্থ অনুধাবনে কুরআন হাদীসের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যাকে তারা এড়াতে পারেনি। হযরত উমর রা. এর একটি বাণী এ সত্যকে আরো যথার্থ করে তোলে। তিনি বলেন, 'সুদের নিষেধাজ্ঞাসূচক আয়াতসমূহ কুরআন অবতীর্ণকালীন সময়ের শেষ দিকে নাযিল হয়েছে। ফলে এগুলোর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পুরোপুরিভাবে মানুষ আত্মস্থ করার আগেই রসূল স. ইহলোক ত্যাগ করেন, সুতরাং তোমরা সুদ ও এর সন্দেহপূর্ণ কাজ-দুটোই পরিহার কর। উমর রা. একই সঙ্গে আরবী ভাষা সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বে ছিলেন সমান পারঙ্গম। তা সত্ত্বেও তিনি সুদের ব্যাপ্তিকে তার ভাষাগত যোগ্যতায় সীমাবদ্ধ করেননি। এছাড়া সেকালে সোনার বিনিময়ে সোনা এবং রূপার বিনিময়ে রূপার মধ্যে

লেখক : আহমদ ইবনে আলী আবূ বকর আর রাযী আল্‌জাস্‌সাস। জন্ম ৩০৫ হি: মৃত্যু ৩৭০ হি: বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। আহকামুল কুরআন ও আদাবুল কাযা তাঁর রচিত বিশ্বখ্যাত কারনামা। তিনি হাফেযে হাদীস ছিলেন।

পরিমাণগত অসমতার ভিত্তিতে লেনদেন হত। এক্ষেত্রে তারা সুদের অস্তিত্ব অনুভব করত না। অথচ শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সুদের পারিভাষিক অর্থের দৃষ্টিতে তা সন্দেহতীতভাবে সুদী কারবার রূপে গণ্য।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, নামায রোজা ও হজ্ব, যাকাতের মতো সুদও এমন একটি বিশেষ শব্দ, যার পারিভাষিক অর্থ মূল লক্ষ, শাব্দিক অর্থ নয়। কুরআনের যে আয়াতগুলো ইসলামী বিধান সংক্রান্ত, সেগুলোর উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা ও বিবরণ আল্লাহ্ তাঁর রসূলের মাধ্যমে সমকালীন উম্মতকে জানিয়ে দিয়েছেন, যা কাল পরিক্রমায় বিশ্বস্ত আলেম শ্রেণীর নির্ভরযোগ্য বর্ণনা সূত্রে আজো মুমিনগণ অবলম্বন করে চলেছেন। সে মতে সুদ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসের জ্ঞানও আলেমগণ থেকেই আহরণ করতে হবে।

সুদের প্রাচীন ব্যাখ্যা

সে কালে ঋণের ক্ষেত্রে মূল দেনার অতিরিক্ত আদান প্রদানকে সুদ বলা হত। তা থেকে নিষেধ করেই মহান আল্লাহ্ বলেছেন,'আর তোমরা যা অতিরিক্ত প্রদান কর মানুষের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য, তা আল্লাহর নিকট কোন প্রবৃদ্ধি ঘটায় না।' (সূরা রুম, ৩৯)

অনুরূপভাবে, 'তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ গ্রহণ করো না।' (আলে ইমরান, ১৩০) সুদ বলতে আরবরা উল্লেখিত প্রক্রিয়াটিই জানত। অত:পর কুরআন অর্থ-সম্পদের লেনদেনের ক্ষেত্রে শোষণ ও প্রতারণামূলক যে কোনো প্রদান বা গ্রহণকে সুদ আখ্যা দিয়েছে। এরশাদ হয়েছে, 'এবং তিনি (সাধারণ অর্থে যে কোন) সুদকে হারাম করেছেন।' এই আয়াতের ব্যাপকতার ভিত্তিতে রসূল স্বীয় হাদীসে পরিমাপযোগ্য বা ওজনযোগ্য বস্তুর পারস্পরিক লেনদেন কোন পক্ষের অতিরিক্ত গ্রহণ করা বা প্রদান করাকে সুদ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

সুদের প্রকারসমূহ

সুদের বিভিন্ন প্রকার ও ধরন রয়েছে তার সার সংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

(১) ঋণের আদান প্রদানকালে ঋণগ্রহীতাকে মূলদেনার অতিরিক্ত প্রদানে বাধ্য করা। তৎকালীন আরবে এরূপ প্রথার বেশ প্রচলন ছিল।

(২) সোনা, রূপা, ও মুদ্রা এবং ওজনযোগ্য বা পরিমাপযোগ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে একজাতীয় বস্তুর পারস্পরিক নগদ লেনদেন পরিমাণগত সমতা রক্ষা না করা। এটা ইমাম আবূ হানিফার মতে। ইমাম মালেক র.-এর মতে খাদ্য ও গুদামজাতযোগ্য দ্রব্য সমজাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে কমবেশি করে আদান প্রদান করা। আর ইমাম শাফেয়ী র.-এর মতে শুধু খাবারযোগ্য দ্রব্যের পারস্পরিক লেনদেনকালে কোন এক পক্ষের অতিরিক্ত গ্রহণ করা বা প্রদান করাকে সুদ বলে।

(৩) মেপে বা ওজন করে পরিমাণ নির্ণয় করা হয় এমন একজাতীয় দ্রব্য নগদ বা বাকী বেচাকেনা করা। যেমন : একজন কাউকে একমণ চাল দিল এশর্তে যে, সে তাকে ছ'মাস পর বিনিময় স্বরূপ

একমণ চাল দিবে। এক্ষেত্রে উভয়ের চালের পরিমাণ সমান সমান হলেও লেনদেনটি নগদ হয়নি, নগদ বাকী হয়েছে। তাই সময়ের ব্যবধানজনিত তারতম্যের কারণে এটি সুদী কারবার হয়েছে।
(৪) মাপ ও ওজনে পরিমাণ নির্ণীত দ্রব্যের ক্ষেত্রে দু'টি ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের নগদ বাকী লেনদেন কালে কোন একজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করা বা প্রদান করা। যেমন, একশ কেজি ডাল দু'শ কেজি আলুর বিনিময়ে নগদ বিক্রি করা হলে তা পরিমাণে কমবেশি হলেও সুদ হবে না। কিন্তু এ কারবারটা নগদ বাকীতে সম্পন্ন হলে তা সুদী কারবার হবে।
সুদের উপরোক্ত শ্রেণীগুলোকে কুরআনের-১৩০নং ও ২৭৫ নং আয়াতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে রসূল স.-এর দু'টি হাদীসেও তা হারাম সাব্যস্ত হয়। হযরত উবাদা বিন সাবিত রা.-এর সূত্রে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে, 'সোনা, সোনার বিনিময়ে, রূপা, রূপার বিনিময়ে, গম, গমের বিনিময়ে, যব যবের, খেজুর খেজুরের এবং লবণ, লবণের বিনিময়ে ক্রয় বিক্রয় হলে, তাতে পরিমাণ সমান সমান হতে হবে এবং নগদানগদ হতে হবে। অতিরিক্ত গ্রহণ বা প্রদান সুদ হিসেবে বিবেচিত হবে। এ হাদীসে ওজনযোগ্য বা পরিমাপযোগ্য দ্রব্য সমশ্রেণী দ্রব্যের বিনিময়ে লেনদেন করার সময় অতিরিক্ত গ্রহণ করাকে সুদ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে হযরত উসামা বিন যায়েদ রা.-এর সূত্রে বর্ণিত এক হাদীসে রসূল স. বলেন 'নাসিয়া তথা বাকী লেনদেনে সুদ বিদ্যমান।' কেননা পণ্যের বিনিময়ে যদি পণ্যের নগদবাকী লেনদেন হয়, তাহলে যে আগে পণ্য পাবে সে অপরের তুলনায় অধিক মুনাফা অর্জনের সুযোগ লাভ করবে। বস্তুত সময়ের ব্যবধান জনিত এই বাড়তি সুবিধাই যা শুধু একজন ভোগ করে, অপরজন বঞ্চিত হয়, বিদ্যমান হাদীসে সুদ বিবেচিত হয়েছে।
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. সম্পর্কে জানা যায়, তিনি শুধু বাকী লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রদত্ত্ব বা গৃহীত অতিরিক্ত অংশকে সুদ সাব্যস্ত করতেন। নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে পণ্য ও মূল্য সমশ্রেণীর হওয়া সত্ত্বেও তাতে কমবেশি করাকে সুদ জ্ঞান করতেন না। তিনি তাঁর মতের স্বপক্ষে হযরত উসামার বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করতেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে হযরত উবাদা রা. এর বর্ণিত হাদীস শোনার পর তিনি তাঁর পূর্বের মনোভাব পরিবর্তন করেন এবং এক জাতীয় দ্রব্যেরে নগদ লেনদেনেও সুদের সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নেন। হযরত জাবের ইবনে যায়েদের সূত্রে ইবনে আব্বাস সম্পর্কিত এই তথ্য জানা যায়।

সুদের আরেকটি প্রকার

বাকীমূল্যে কোন বস্তু কিনে মূল্য পরিশোধের পূর্বেই তা বিক্রেতার কাছে অপেক্ষাকৃত কমমূল্যে বিক্রি করে দেয়া একটি সুদী কারবার। ইউনুস বিন ইসহাক তার পিতা থেকে হযরত আবুল আলীয়ার বরাত দিয়ে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে হযরত আবুল আলীয়া বলেন, 'আমি একবার হযরত আয়েশা'র কাছে উপবিষ্ট ছিলাম, এ সময় অজ্ঞাত এক মহিলা এসে বললেন, আমি যায়েদ বিন আরকামের কাছে আটশ' টাকায় একটি দাসী বাকী বিক্রি করে ছ'শ নগদ টাকায় ফের

তার কাছ থেকেই ক্রয় করে নিয়েছি। এ কথা শুনে আয়েশা রা. ভীষণ রাগ করে বললেন, তোমার বিক্রয় এবং ক্রয় দুটোই অসৎপ্রণোদিত। আর শোন, যায়েদকে আমার এই প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দিও যে, যদি তিনি যথাযথ অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা না করেন, তাহলে রসূল স.-এর সঙ্গে সম্পাদিত তার জিহাদী কার্যক্রমের সকল অর্জন ও প্রাপ্তি অনর্থ ও নিষ্ফল প্রমাণিত হবে। মহিলা জিজ্ঞেস করল, যদি আমি আমার বিক্রিত পণ্যই গ্রহণ করি এবং অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ না করি তাহলে আপনি এটাকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন? উত্তরে আয়েশা রা. একটি আয়াত পাঠ করলেন, 'সুতরাং যার কাছে স্বীয় প্রভুর কোন উপদেশবাণী এসে পৌঁছায় এবং তৎক্ষণাৎ সে সুদী প্রবণতা পরিহার করে, তাহলে পূর্বের অপরাধ থেকে সে নিস্তার পাবে।' এ ঘটনায় মহিলার প্রশ্নে হযরত আয়েশা রা.-এর সুদ সংক্রান্ত আয়াত পাঠ করার ফলে প্রমাণিত হয় যে, উল্লেখিত প্রক্রিয়ায় বেচা-কেনা করা প্রকারান্তরে সুদী কারবার করার নামান্তর। আর এটিও সত্যি যে, আয়েশা রা. এরূপ মন্তব্য নিজে থেকে করেননি, বরং রসূল স.-এর মুখে শুনেই তা বলেছেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক ও হাকাম বিন যুরাইক প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, প্রসিদ্ধ তাবেঈ হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়াব রা.-কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনিও একে সুদ আখ্যা দিয়েছেন। হযরত হাসান বসরী ও ইবনে সিরিন এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এক্ষেত্রে কিছু শর্ত আরোপ করলেও তাঁদের সমসাময়িক বিজ্ঞ আলেমগণ যেমন, ইবনে আব্বাস, কাসেম বিন মুহাম্মদ, মুজাহিদ, ইব্রাহীম এবং শা'বী র. প্রমুখ এটাকে সরাসরি সুদ বলেছেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, বাকী মূল্যে বিক্রিত মাল ক্রেতা থেকে অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূল্যে ক্রয় করলেই সুদ হবে। সমমূল্যে ক্রয় করলে তা সুদী কারবার হবে না।

পরোক্ষভাবে সুদ গ্রহণের একটি পদ্ধতি

প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষভাবে সুদ গ্রহণ বা প্রদান করার একটি সূক্ষ্ম পদ্ধতি তৎকালীন আরবে প্রচলিত ছিল। তা এই যে, বিলম্বে পরিশোধযোগ্য ঋণ নগদ আদায় করা এ শর্তে যে, ঋণদাতা তার প্রাপ্যের কিছু অংশ গ্রহীতার জন্য মওকুফ করে দিবে। যেমন, এক ব্যক্তি অপরের কাছে দশ হাজার টাকা পাবে, যা ছ'মাস পর আদায়যোগ্য, সে যদি তা নগদ উসূল করে এবং এই নগদ প্রদানের সুবাদে পাঁচশ টাকা ঋণ গ্রহীতাকে ছাড় দেয় তাহলে তা সুদ হবে। কেননা এই পাঁচশ' টাকা গ্রহীতা না দিয়ে বেঁচে গেল, অথচ এর বিনিময়স্বরূপ ঋণদাতা কিছু পেল না। আর ঋণের আদান প্রদানে বিনিময়হীন লভ্যাংশকেই সুদ বলে। ইবনে উমর রা.-কে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি তা সুদ বলেছেন। যায়েদ বিন সাবিত, সাঈদ বিন যুবাইর, শাবী ও হাকাম এবং হানাফী মাযহাবের ইমামগণসহ সকল ফকীগণের অভিন্ন মন্তব্য হলো এটা হারাম। উপরে উল্লেখিত সুদের বিভিন্ন ধরন ও প্রক্রিয়াগত আলোচনা থেকে সুদের যে ক'টি প্রকার বেরিয়ে আসে তা অনেকটা নিম্নরূপ–

(১) সমশ্রেণী পণ্যের পারস্পরিক নগদ লেনদেনে পরিমাণগত সমতা বিধান না করে, কোন একজনের অপরের তুলনায় বেশি গ্রহণ করা। উবাদা বিন সাবিতের হাদীদের ভাষ্য মতে এমনি বোধগম্য হয়।

(২) সোনা, রূপা ও অন্য যে কোন একজাতীয় দ্রব্যের পরস্পরে নগদবাকী লেনদেন হলে তাতে পরিমাণ সমান হলেও সময়ের ব্যবধানজনিত তারতম্যের কারণে সুদ হবে। আর পণ্য ও মূল্য ভিন্ন জাতীয় দ্রব্য হলে তাতে পরিমাণগত বৈষম্য বৈধ, তবে এ ক্ষেত্রেও নগদ লেনদেন হতে হবে। নগদ-বাকী হলে সুদ হবে।

(৩) বাকী মূল্যে বিক্রয় করা দ্রব্য অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যে একই ব্যক্তি হতে কিনে নেয়া।

(৪) প্রাপ্য অংশের কিছু ছাড় দেয়ার শর্তে বিলম্বে পরিশোধযোগ্য ঋণ নগদ উসূল করা।

সুদের শর্ত এবং ইমামগণের মতবিরোধ

উবাদা বিন সাবিত রা. এর হাদীসে যে নির্দিষ্ট ছয়টি বস্তুর কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, তাতে এক প্রজাতির পারস্পরিক লেনদেন করার সময় কমবেশি করলে বা সমান সমান করে নগদ-বাকী বিক্রি করলে তা সুদী কারবার হবে। মূলত শুধু ঐ ছয় প্রকার দ্রব্যের মধ্যে সুদ হারাম হওয়ার হুকুম সীমাবদ্ধ নয়, বরং অন্যান্য দ্রব্যও এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে। যে কারণ ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকায় উল্লেখিত দ্রব্যাদির পারস্পরিক ক্রয় বিক্রয়কে হাদীসে সুদী কারবার বলা হয়েছে, সে কারণ ও বৈশিষ্ট্য অন্য যে কোন দ্রব্যে থাকা প্রমাণিত হলে তা সুদ হবে। তবে এই কারণ নিরূপণ করতে গিয়ে ইমামগণ মতবিরোধ করেছেন।

* ইমাম আবু হানীফা ও তার সঙ্গীদের মত হলো, (১) পণ্য ও মূল্য দু'টোই সমশ্রেণীর হওয়া। যেমন, গমের বিনিময়ে গম, ধানের বিনিময়ে ধান ইত্যাদি। (২) পণ্য ও মূল্য উভয়ই ওজনযোগ্য বা পরিমাপযোগ্য হওয়া।

* ইমাম শাফেয়ী র.-এর মতে, সমজাতীয় হওয়া এবং খাবারযোগ্য হওয়া।

* ইমাম মালেকের মতে খাদ্যযোগ্য গুদামজাতযোগ্য হওয়া।

হানাফীদের দলিল হলো, হাদীসে ওজন ও কাইল তথা পরিমাপের কথা উল্লেখ হয়েছে। সুতরাং এটা সুদের শর্ত হবে।

অন্যদের দলিল হলো, কুরআনে সুদ গ্রহণকে 'ভক্ষণ' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এজন্য খাদ্যযোগ্য দ্রব্যেই সুদের প্রশ্ন হবে।

অভাবী ঋণগ্রস্তকে অব্যাহতি দিতে পাওনাদার বাধ্য নয়

ঋণী ব্যক্তি আর্থিক দৈন্য ও অসচ্ছলতার শিকার হলে এবং বিচারকের নিরপেক্ষ তদন্তে তা সত্য প্রমাণিত হলেও তার উপর তার দেনা পরিশোধ করতে পাওনাদার চাপ সৃষ্টি করতে পারবে এবং সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত তাকে সুযোগ প্রদানে সে আইনগতভাবে দায়বদ্ধ নয়। ইমাম মালেক ও শাফেয়ী র. অবশ্য এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তাদের মতে ঋণগ্রস্তকে সচ্ছল না হওয়া পর্যন্ত তার দেনা পরিশোধ করতে বাধ্য করা যাবে না। হানাফীদের যুক্তি হলো একটি ঘটনা, যা হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা রা. বলেন, একবার রসূল স. এক বেদুঈন থেকে

নির্দিষ্ট সময়ের শর্তে একটি উট বাকী ক্রয় করলেন। অতপর নির্ধারিত সময়ে লোকটি রসূলের কাছে এসে তার পাওনা চাইল। রসূল স. বললেন, এ মুহূর্তে আমার হাত শূন্য। একটু অপেক্ষা করুন। কিছু ছদকা বা দান এসে গেলে তা থেকে আপনার মূল্য দিয়ে দেব। এ কথা শুনে লোকটি রাগে বলে উঠল 'এটা ধোকা ও প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়।' লোকটির এই অসৌজন্যতায় হযরত উমর রা. ক্ষুব্ধ হলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু রসূল স. তাকে বাধা দিয়ে বললেন, উমর শান্ত হও! তাকে বলতে দাও। কেননা পাওনাদারের কিছু বলার অধিকার থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে অনুরূপ একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এক ব্যক্তি কারো কাছে দশ দিনার পেত। যথাসময়ে সে তার কাছে পাওনা চাইল। ঋণগ্রস্ত লোকটি বলল, আল্লাহর শপথ, আজ আমার কিছু দেয়ার মত নেই। জবাবে পাওনাদার বলল, কী বললে! এক্ষুণি তোকে উঠিয়ে নিয়ে যাবো। হয় টাকা দেবে না হয় কাউকে এর জন্য জামিন করবে। লোকটি অসহায় কণ্ঠে জবাব দিল, ঋণ শোধ করতে আমার কাছে কোন টাকাও নেই। অন্যদিকে জামিন বানাবার মতো আপনজন কেউ নেই। অতপর অনন্যোপায় হয়ে সে রসূলের কাছে এসে অভিযোগের সুরে বলল, তার পাওনা শোধ করার মত আমার কিছু নেই জেনেও সে আমার পিছু ছাড়ছে না। এক মাস সময় চেয়ে করজোড় আবেদন করলে তাও নাকচ করে দিচ্ছে। রসূল স. পাওনাদারকে বললেন, আমি তার ঋণের জামিন হলাম। একথা শুনে লোকটি চলে গেল এবং পরবর্তী সময়ে এসে রসূল স. থেকে তার পাওনা বুঝে নিল। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে আরেকটি ঘটনা বর্ণিত আছে। তা এই যে, এক বেদুঈন রসূলের কাছে কিছু খেজুর পেত। লোকটি এসে সাহাবীগণের জনাকীর্ণ মজলিসে রসূল স.-এর কাছে খেজুর চেয়ে বসল এবং অবস্থা দৃষ্টে সে বুঝে নিল তার পাওনা হয়ত তখন পাওয়া যাবে না। ফলে রসূল স.-এর উপর প্রচণ্ড রাগ করল। এমনকি এক পর্যায়ে সে রসূল স.-কে জীবন নাশের হুমকি দিল। উপস্থিত সাহাবীগণ একথা শুনে প্রচণ্ড মারমুখো হয়ে লোকটির দিকে তেড়ে আসতে লাগল। রসূল স. তখন তাদের বাধ সাধলেন এবং খাওলা বিনতে কায়স রা.-এর কাছে লোক পাঠালেন এই বলে যে, কিছু খেজুর তুমি আমাকে এখন দাও, পরে আমি তা শোধ করে দেব। অতপর রসূল স. হযরত খাওলার পাঠানো খেজুর দিয়ে লোকটির ঋণ শোধ করলেন এবং তাকে সৌজন্য আপ্যায়ন করলেন। এতে সে দারুণ অভিভূত হয়ে বলল, আপনি আমার প্রাপ্য পুরোপুরি প্রদান করেছেন, আল্লাহ যেন আপনার প্রতিদান দান করেন ষোলআনা। লোকটি কথা শেষে চলে গেলে রসূল স. বললেন, সে অত্যন্ত সৎ এবং ভদ্র। শোন, ঐ জাতি কখনো উন্নত আদর্শের অধিকারী হয় না যাদের দুর্বলেরা তাদের সবলদের কাছে অধিকার বঞ্চিত হয়। উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে যে সহজ সরল একটি কথা বেরিয়ে আসে তাহলো ঋণগ্রস্তের অভাব ও অসচ্ছলতার কারণে পাওনাদারকে তার প্রাপ্য দাবী করা থেকে বিরত রাখা বৈধ হবে না। ঋণ পরিশোধের নির্দিষ্ট তারিখ পিছিয়ে মেয়াদ দীর্ঘায়িত করতেও তার উপর অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করা চলবে না। একটি হাদীসে তো রসূল স. সরাসরি বলেছেন, পাওনাদার

(তার দেনা উসুল করতে গিয়ে) স্বীয় হাত ও মুখ ব্যবহার করতে পারে। হাদীসটির বর্ণনাকারী মুহাম্মদ হাসান রা. বলেন, হাত ব্যবহারের অর্থ ঋণগ্রস্তের পিছু ধরা এবং মুখ ব্যবহারের অর্থ প্রাপ্য চাওয়া। তবে ঋণদাতা ইচ্ছা করলে এক্ষেত্রে নমনীয়তা অবলম্বন করতে পারে। ঋণগ্রহীতাকে সময় আরো বাড়িয়ে দেয়া, সম্পূর্ণ ঋণ বা তার কিছু অংশ ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমে বদান্যতাসুলভ আচরণের মধ্যে পাওনাদারের জন্য অসামান্য মর্যাদা ও পুরস্কারের সুসংবাদ রয়েছে। রসূল স. বিভিন্ন হাদীসে এর প্রতি বেশ উৎসাহ প্রদান করেছেন।

হযরত ইবনে বুরাইদা তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম স. বলেছেন, 'যে ঋণদাতা তার অভাবী ঋণগ্রস্তকে সুযোগ বাড়িয়ে দেবে (ঋণ প্রদানের নির্দিষ্ট মেয়াদোত্তীর্ণের পর) সে একটি ছদকার সওয়াব পাবে। আর ঋণ আদায়ের তারিখ আসার পূর্বেই সুযোগ প্রদান করলে সে প্রতিদিন সদকা করার সওয়াব লাভ করবে।' হযরত আবুল য়ুসর রা. সূত্রে অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্তকে পর্যাপ্ত সময় দেয় বা কিছু অংশ ছেড়ে দেয় হাশরের দিন আল্লাহ্ তাকে আরশের নীচে ছায়া দান করবেন। হযরত হুজায়ফা রা. থেকে বর্ণিত যে, রসূল স. বলেছেন (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ এক বান্দাকে প্রশ্ন করবেন, তুমি আমার জন্য দুনিয়াতে কী আমল করেছ? সে উত্তর দেবে আমি বেশি নামায পড়িনি এবং বেশি রোযাও রাখিনি যার ফলে দয়াময়ের বিশেষ রহমতের আশা করতে পারি। তবে হে আমার প্রভু! আমি বিত্তশালী লোক ছিলাম। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতাম। যারা সচ্ছল তাদের সাথে ভদ্রোচিত আচরণ করতাম এবং অভাবী ও দরিদ্রলোকদের ঋণ দিয়ে তা আদায় করতে যথেষ্ট সময় সুযোগ প্রদান করতাম। তখন আল্লাহ বলবেন, আমি এই বান্দার যথাযোগ্য হক প্রদান করব। অতপর তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। এ হাদীস থেকে একই সঙ্গে দুটি বিষয় প্রকাশ পেল। এক. ঋণগ্রহীতার প্রতি যথার্থ বিনম্র আচরণ করার দরুণ আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার অধিকারী হওয়া যায়। দুই স্বচ্ছল ঋণী ব্যক্তির প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন এবং অভাবী ঋণগ্রস্তকে তার দেনা আদায় করতে সুযোগ প্রদান করাকে পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় প্রথম কাজটি যেমন ঋণদাতার জন্য বাধ্যতামূলক নয়, তেমনি দ্বিতীয়টিও অপরিহার্য নয়। বরং উত্তম ও প্রশংসনীয় একটি কাজ। কোন কোন আলেমের মন্তব্য হলো, ঋণগ্রহীতা অভাবী ও নিঃস্ব হয়ে পড়লে তার উপর থেকে দেনার দায়দায়িত্ব রহিত হয়ে যায়। তখন পাওনাদার তার উপর চাপ প্রয়োগ করতে পারবে না। তাদের যুক্তি এই যে, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. এর বর্ণনায় পাওয়া যায়, এক ব্যবসায়ী লোক দারিদ্র্যের শিকার হয়ে অল্প দিনেই তার মাথায় বিশাল অংকের ঋণ চেপে বসে। সে নিরূপায় হয়ে রসূলের কাছে এসে সাহায্য চাইল। রসূল স. উপস্থিত লোকদের বললেন, একে দান কর। সকলে তাকে দান করে সহায়তা করল। কিন্তু দানে যে অর্থ জমা হয়েছে তা ঋণের তুলনায় অপ্রতুল। তখন রসূল স. পাওনাদারগণকে বললেন, তোমরা এগুলোই ভাগ করে নিয়ে নাও এখন। পরে কিছু চেয়ে তাকে আর বিরক্ত কর না; সুতরাং এ ঘটনায় প্রতিয়মান হয় যে ঋণী ব্যক্তি অভাবী হয়ে গেলে শোধ করার

দায়িত্ব তার সাধ্য ও সামর্থ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাকে সাধ্যের বাইরে বাড়তি চাপ দেয়া নীতিসম্মত নয়।

ঋণ পরিশোধে টালবাহানার শাস্তি

সাধারণ বৈধ ঋণ কিংবা সুদী ঋণে আবদ্ধ ব্যক্তি অভাবী, অসচ্ছল হয়ে পড়লে তাকে মানবিকতা সুলভ সময় সুযোগ বাড়িয়ে দেয়ার সমর্থনে যে আয়াতটি পরিচিত, সুবিদিত তা হলো, 'আর যদি সে রিক্ত হস্ত হয় ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়, তাহলে তাকে স্বাবলম্বী হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দেয়া বিধেয়।' হযরত ইবনে আব্বাস কাজী সুরাইহ এবং ইব্রাহীম র. এই আয়াতকে শুধু সুদভিত্তিক ঋণে আবদ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন। তাঁদের দৃষ্টিতে সুদকে প্রথমে হারাম করা হয়েছে, এ আয়াত দ্বারা 'তোমরা অতিরিক্ত মানে সুদকে সর্বাত্মক পরিহার কর।' অতঃপর ঋণের মূলধন পরিশোধ করার সামর্থ না থাকলে তাকে সুযোগ দিতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে উল্লেখিত আয়াতটিতে। সুতরাং বলা চলে আয়াতটি শুধু সুদী ঋণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অন্যদিকে অন্যরা বিশেষত ইমাম জাস্সাস র. বলেন যে, আয়াতটি সুদসহ সকল প্রকার ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা আয়াতে সুদের সরাসরি কোনো আলোচনা নেই। সাধারণ অর্থে ঋণ বলতে যা বুঝায় আয়াতে তারই কথা বলা হয়েছে। তাই যে কোন ঋণ তার অন্তর্ভুক্ত। তবে ঋণ পরিশোধের অর্থ ও সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যদি ঋণগ্রহীতা তা পরিশোধ না করে তাহলে তার এই টালবাহানার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার অধিকার পাওনাদারের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত এক হাদীসে সচ্ছল, ধনীদের টালবাহানকে জুলুম আখ্যায়িত করা হয়েছে। অন্য হাদীসে পাওনাদারকে তার গ্রহীতার এরূপ আচরণের জন্য তাকে আটক করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত হলো, যে কোনো ঋণগ্রহীতা যথাসময়ে তার দেনা শোধ করতে না পারলে তাকে পাওনাদার দুই থেকে তিন মাস পর্যন্ত আটকে রাখার অধিকার লাভ করবে। অতঃপর সুষ্ঠু তদন্তের পর যদি সে সচ্ছল, সামর্থবান প্রমাণিত হয় তাহলে ঋণ আদায় করা পর্যন্ত তাকে আটকে রাখা যাবে। কিন্তু একান্ত দরিদ্র, অভাবী হলে তাকে ছেড়ে দিতে হবে। মালেকী মাযহাবের মতে, ঋণী স্বাধীন হোক, গোলাম হোক তাকে আটকে রাখা যাবে না এবং তার সম্পর্কে তদন্ত করা নীতিবহির্ভূত কাজ এবং প্রহসনমূলক আচরণ বলে গণ্য হবে। হ্যাঁ, লোকমুখে তার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ঋণ অনাদায়ের অভিযোগ জানা গেলে কেবল অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের স্বার্থে তাকে সাময়িক নজরদারীর মাধ্যমে গৃহবন্দী রাখা যাবে। শাফেয়ী মাযহাব মতে, সচ্ছল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তার দেনা শোধ না করার অপরাধে তার যাবতীয় বিলাসী ও অপ্রয়োজনীয় সম্পদ বিক্রি করে তা থেকে পাওনাদার তার প্রাপ্য বুঝে নিতে পারবে। আর সত্য সত্যই অভাবী সাব্যস্ত হলে তাকে অবকাশ দেয়া পাওনাদারের অনিবার্য দায়িত্ব।

অনুবাদঃ এম রহমান হাবীব

ইসলামে পানি আইন ও বিধিমালা

মুহাম্মদ নূরুল আমীন

এক.

রসূল স-এর আবির্ভাবের পূর্বে জাহেলিয়াতের যুগে আরব দেশসমূহে পানি ব্যবহারের প্রতিষ্ঠিত কোনও বিধি বিধান ছিল না। প্রাচীন আরবরা ছিল বেদুইন। তারা খেজুর বাগান, জয়তুনগাছ, বহমান স্রোতধারা অথবা কুয়ার ধারে তাবু গেঁড়ে কিছুদিন বসবাস করে পুনরায় অন্যস্থানে চলে যেতো, বংশ পরম্পরায় স্থায়ী বাসিন্দাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে তাদের পানি স্বত্ব নির্ধারিত হতো। স্থানীয় বাসিন্দারা শক্তিশালী হলে বেদুইনরা তাদের প্রথা পদ্ধতিকে সম্মান করতো, দুর্বল হলে কুয়া কিংবা পানির আধার নিয়ে ঝগড়া-ঝাটি লেগেই থাকতো। কুয়ার মালিকানার ক্ষেত্রে গোত্র মালিকানা এবং ব্যক্তি মালিকানা উভয় পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই কুয়ার মালিকরা পানি প্রত্যাশী বহিরাগতদের কাছ থেকে ফিস আদায় করতো। যারাই নিজেদের জন্য অথবা পশু-পাখীর জন্য পানি নিতে আসতো তাদের সবাইকেই এই ফিস দিতে হতো। পানি বিক্রি ছিল একটা সাধারণ প্রথা এবং পানির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ঐ যুগে বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। আরবের দক্ষিণাঞ্চল, বিশেষ করে হেজাজের ন্যায় স্থায়ী বসতিপূর্ণ এলাকায় পানি সম্পদের প্রাচুর্য ছিল এবং এক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানায় পানির অধিকার ও দায়-দায়িত্ব নির্ধারিত হতো। তবে সাধারণভাবে পানি ছিল দুষ্প্রাপ্য এবং বেদুইন কিংবা স্থায়ী বাসিন্দা, উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই এই সংকট ছিল একটি দুরূহ সংকট। রসূল স.-এর শিক্ষার ভিত্তিতেই আরব দেশসমূহে পানি সংক্রান্ত প্রথম আইন প্রণীত হয়।

ইসলামে পানি আইনের ধারণা ও মূলনীতি

ইসলামে পানি আইনের ধারণা সম্পর্কে অবহিত হতে হলে এই আইনের উৎস সম্পর্ক একটা স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার।

ইসলামী আইনের চেতনা ও মূলনীতির উৎস হচ্ছে আল্লাহর কুরআন ও রসূল স.-এর সুন্নাহ। এ প্রেক্ষিতে সমগ্র ইসলামী ব্যবস্থা ও পদ্ধতিই চরিত্রগত দিক থেকে ধর্মীয় এবং ইসলামের সকল বিধি বিধান, ঈমান আকিদা ও নীতি নৈতিকতা এর অন্তর্ভুক্ত।

বলা বাহুল্য চারটি বুনিয়াদের উপর ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত। এগুলো হচ্ছে ১. আল্লাহর কুরআন ২. রসূল স.-এর সুন্নাহ ও হাদিস ৩. ইজমা এবং ৪. কিয়াস।

লেখক : গবেষক ও প্রাবন্ধিক।

ইসলামী শরিয়ার মূলনীতির পরিপন্থী না হলে স্থানীয় রীতি বা প্রথাকেও ইসলামী আইন সম্মান প্রদর্শন করে এবং সম্পূরক উৎস হিসেবে তাকে স্বীকৃতি দেয়। অবশ্য ইসলামী আইনের চতুর্থ বুনিয়াদ 'কিয়াস'-এর ব্যাপারে ইসলামের অনুসারী বিভিন্ন মযহাব ও মতাবলম্বীদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির প্রচুর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে সুন্নি এবং শিয়াদের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যই প্রবল। সুন্নিদের চারটি মযহাবের মধ্যে তিনটি মযহাবই (হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী) নিঃশর্তভাবে কিয়াসকে আইনের চতুর্থ উৎস হিসেবে স্বীকার করে, হাম্বলীরা কতিপয় শর্তসাপেক্ষে এর উপর আস্থাশীল। পক্ষান্তরে শিয়া মতাবলম্বীরা কিয়াসকে সম্পূর্ণভাবে নাকচ করে দেয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিশ্বের বর্তমান জনসংখ্যা হচ্ছে প্রায় ৬৫০ কোটি এবং এর মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা হচ্ছে প্রায় ১৬২ কোটি। মোট মুসলিম জনসংখ্যার ৯১ শতাংশ হচ্ছে সুন্নী এবং অবশিষ্ট ৯ শতাংশ হচ্ছে শিয়া ও খারিজী মতাবলম্বী। এ প্রেক্ষিতে ইসলামী পানি আইন প্রণয়নের বেলায় শিয়া সুন্নী মতবাদ এবং বিভিন্ন মযহাবের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা বিভিন্ন মতবাদ, দল উপদল ও মযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কেও উপযুক্ত ক্ষেত্রে কিছুটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করবো।

ইসলাম সর্বদা ঈমান আকিদার ভিত্তিতে সাম্য নির্বিশেষে সকল মানব জাতির কল্যাণকে তার শরিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেছে। মানুষের জীবন ও সম্পত্তি, ঈমান ও বুদ্ধিমত্তা এবং ভবিষ্যত বংশধরদের নিরাপত্তার উপরই এই কল্যাণ নির্ভরশীল। এই পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিকাশ ও নিরাপত্তার জন্য গৃহীত যাবতীয় কর্মকাণ্ডই জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবং ইসলামী পানি আইনের যথার্থতাও এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। গোষ্ঠী জীবনকে নিরুৎসাহিত করে ইসলাম সমাজের মূল স্রোতধারার সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছে এবং এরই অংশ হিসেবে ইসলামী আইন সকল মানুষের প্রয়োজন পূরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। রসূলুল্লাহ স. অভাবগ্রস্তদের অভাব পূরণে দান সাদাকার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে নিরুৎসাহিত করেছেন। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন, 'অতঃপর যারা অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে তারা তার প্রতিফল দেখতে পাবে এবং যারা অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে তারাও তা দেখতে পাবে।'

ভাল কাজ তথা পুন্য বা সাদাকার মূলনীতিকে সামনে রেখে রসূল স. পানিকে আল্লাহর দেয়া নেয়ামত হিসেবে গণ্য করেছেন এবং এর উপর মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, পানির উৎসে অবাধে প্রবেশাধিকার সকল মুসলমানের রয়েছে। পানিকে তিনি আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে পবিত্রতা অর্জনের জন্য অমূল্য এবং অপরিহার্য বস্তু হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'প্রাণবন্ত সব কিছু আমরা পানি থেকে সৃষ্টি করেছি।' (সূরা জাসিয়া, আয়াত : ৩০)। বোখারী শরীফের হাদিসে আছে, 'যারা অন্যদের প্রয়োজনে পানি প্রদানে অস্বীকার করবে আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যে বলবেন, আজ আমি তোমাদেরকে আমার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করছি যেমনি তোমরা তোমাদের এমন উদ্বৃত্ত বস্তু অন্যদের দিতে অস্বীকার করেছ; যা তোমরা তৈরি করনি।' (বোখারী শরীফ ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ১০৮, মিশকাত শরীফ

২০ খণ্ড পৃষ্ঠা ৫৫)। আরেকটি হাদীসে আছে, 'পাপাচারী ছাড়া কোনও ব্যক্তি অন্যকে উদ্বৃত্ত পানি দিতে অস্বীকার করতে পারে না।' (কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ৭২, মিশকাত শরীফ ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৫৭) আরো একটি হাদিসে রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, 'রোজ কেয়ামতে তিন ব্যক্তি আল্লাহর উপেক্ষার পাত্র হবে। এদের মধ্যে একজন হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার কাছে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি থাকা সত্ত্বেও সে পথচারীকে পানি দিতে অস্বীকার করেছে।.... ' (বোখারী শরীফ ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ১০৪)।

জীব জন্তুর পানির চাহিদা পূরণের প্রতিও ইসলাম পর্যাপ্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের পর যে পানি অবশিষ্ট থাকবে অবশ্যই তা জীব জন্তুর পাওনা এবং কোনও জীব জন্তু তৃষ্ণায় মৃত্যুবরণ করুক ইসলামের তা কাম্য নয়।

বোখারী শরীফে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে রসূল স. বলেছেন, 'যে বা যারা জীবন্ত প্রাণীকে পানি খাওয়াবে সে বা তারা আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কৃত হবে। (বোখারী শরীফ ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ১০৬)। একই সূত্রের আরেকটি হাদিসে বলা হয়েছে, 'যদি কেউ একটি কুয়া খনন করে এবং তার আশপাশে চারণ ভূমির সৃষ্টি হয় এবং নিকটবর্তী স্থানে আর কোথাও যদি পানি না থাকে তাহলে ঐ কুয়ার পানি দিয়ে গবাদি পশুর তৃষ্ণা নিবারণ করা থেকে কেউ তাদের বাধা দিতে পারবে না।'

পানি ব্যবহারের উপর বিধি নিষেধ

লোকালয়ের সকল মানুষ ও জীব জন্তুকে কষ্ট দেয়া, তাদের কাছ থেকে বেশি মূল্য আদায় করা অথবা সংকট সৃষ্টির লক্ষ্যে যাতে ব্যক্তি বিশেষ পানি মজুদ করে তার সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে তা নিশ্চিত করার জন্য আল্লাহর রসূল স. পানির উপর সমাজের সকলের অধিকার নিশ্চিত করেছেন। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে কাজে লাগানোর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তাঁর পরামর্শে হযরত ওসমান রা. একটি কূপকে ওয়াকফ সম্পত্তিতে রূপান্তর করে তার উপর মুসলিম জনসাধারণের কর্তৃত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। রসূল স. আরো ঘোষণা করেন যে, নীচু জমির পূর্বে উঁচু জমিতে সেচ দিতে হবে এবং পানির মজুতদারী বন্ধ করার জন্য এই মর্মে নির্দেশ দেন যে সংরক্ষিত পানির পরিমাণ হাঁটু সমান হবে, তবে অতিরিক্ত নয়। (বোখারী শরীফ)। তিনি আরো বলেছেন যে, 'কূপের মালিকরা দুর্ঘটনার জন্য দায়ী হবে না।'

'স্বাভাবিক বৃষ্টির তুলনায় কৃত্রিম সেচের মাধ্যমে চাষ কৃত জমিকে বিশেষ সুবিধা দিতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে ওশরের অর্ধেক প্রদেয় হবে।'

আল্লাহর রসূল স. এটা স্বীকার করেছেন যে খাল, বিল, নালা, কুয়া ও পানির অন্যান্য উৎসের মালিকানা সন্নিহিত জমি বা হারিমের মালিকানার উৎসের মালিকানা সন্নিহিত জমি বা হারিমের মালিকানার সাথেও সংশ্লিষ্ট এবং এ প্রেক্ষিতে ঐ সমস্ত জায়গায় নতুন করে কোন কূপ খনন করা যাবে না। কেননা এতে বিদ্যমান কূপের পানি হ্রাস পেতে পারে অথবা তার পানির মান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। (কিতাবুল খারাজ, মিশকাত শরীফ)

পরবর্তী কিস্তিতে আমরা পানির বন্টন, মালিকানা এবং ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

বীমা ব্যবসায় সুদের অস্তিত্ব প্রমাণ ও আরোপিত অভিযোগের জবাব

ডঃ হোসাইন হামেদ হাস্‌সান

বীমা কোম্পানিগুলো যে ধরনের বীমা ব্যবসা করে এ ব্যবসা অবৈধ বা হারাম হওয়ার অন্যতম দলিল হলো, বীমা ব্যবসা তিনভাবে সুদের পর্যায়ে পড়ে।

প্রথমত : বীমা ব্যবসা বীমাকারী ও বীমা কোম্পানির স্থিরকৃত এমন একটি চুক্তির নাম যে চুক্তির ভিত্তিতে বীমাকারী ও বীমা কোম্পানি এই শর্তে নির্ধারিত কিস্তির টাকা পরিশোধ করে যে, বীমাকারী যদি নির্দিষ্ট দুর্ঘটনায় পতিত হয় তাহলে কোম্পানি তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এই চুক্তি বা লেনদেনকে মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা বেচাকেনা বলে অভিহিত করা হয়। বাস্তবে এটাই তো সুদ। যদি সম্ভাব্য প্রাপ্য আর প্রদেয় সমান সমান হয় তাহলেও তা সুদের পর্যায়ভুক্ত হবে। যদি সম্ভাব্য প্রাপ্য বেশি হয় তাহলে অতিরিক্ত মুদ্রাও সুদ বলেই গণ্য হবে।

দ্বিতীয়ত : জীবনবীমার ব্যাপারেও বীমা কোম্পানিগুলোর চুক্তিতে এ ধরনের শর্ত থাকে যে, বীমাকারীর কিস্তি আদায় শেষ হওয়া পর্যন্ত যদি সে বেঁচে থাকে তবে জমাকৃত টাকা থেকেই সে এককালীন আরো বেশি টাকা কোম্পানি থেকে পাবে। এ দিক থেকে বীমা সুদ থেকে মুক্ত নয়।

তৃতীয়ত : বীমা কোম্পানিগুলো তাদের ব্যবসার জন্য সাধারণত যে পন্থা অবলম্বন করে সেগুলোও সুদের উপর নির্ভরশীল। কারণ কোম্পানি ব্যবসায় যেমন মূলধন বিনিয়োগ করে তদ্রূপ বীমার দলিলপত্র বন্ধক রেখে সুদের ভিত্তিতে ঋণও প্রদান করে। কোন পলিসি-হোল্ডার যদি কিস্তি খেলাপ করে তাহলে বিলম্বের জন্যে জরিমানা উসূল করে। বস্তুত যে কোন সুদভিত্তিক ব্যবসা সেই ব্যবসাইকে অবৈধ করে দেয়। উপরে বর্ণিত দলিলের ব্যাপারে বীমা ব্যবসা বৈধতার পক্ষের ব্যক্তিগণ কয়েকটি আপত্তি উত্থাপন করেছেন। আমরা পর্যায়ক্রমে তাদের উত্থাপিত প্রশ্নগুলো উল্লেখ করার পর ধারাবাহিকভাবে জবাব দেবো।

প্রথম আপত্তি : আমরা বীমা সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে এটি একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা এ নিয়ে কথা বলি কিন্তু বীমা কোম্পানিগুলো বীমা ব্যবসা পরিচালনা করে সেসব পদ্ধতি বৈধ না অবৈধ, জায়েয না নাজায়েয এ বিষয়টি আলোচনা করি না। তাই আমরা যখন দেখি শরীয়তের মূলনীতি ও

লেখক : জন্মসূত্রে মিসরীয়। কায়রো আল আযহার ও নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, মুহাম্মদ বিন সনোসী বিশ্ববিদ্যালয় লিবিয়া, বাদশা আবদুল আজীজ বিশ্ববিদ্যালয় সৌদি আরব, কায়েদে আযম ও আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামাবাদ-এ অধ্যাপনা করেন। ইসলামী অর্থনীতি, বীমা, ফিকাহ ও উসূলে ফিকাহ সম্পর্কে তাঁর রচনাবলী বিশ্বব্যাপী নন্দিত।

আইনের নিয়ম অনুযায়ী বীমা ব্যবসা না জায়েয বা হারাম হওয়ার ব্যাপারটি তাকিদ করে না তাই একটি বৈধ ব্যবসায়িক পদ্ধতি হিসেবে আমরা বীমাকে সঠিক বলে অভিহিত করি। এ দিক থেকে বীমা ব্যবসা তার মৌল উদ্দেশ্যে ও ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে একটি জায়েয উদ্দেশ্য ও কল্যাণের পূর্ণতা বিধানে কার্যকর পন্থা। বীমাকে জায়েয বলার দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য এই নয় যে, বীমা কোম্পানিগুলো তাদের পুঁজি বিনিয়োগে ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেভাবেই চালাক না কেন আমরা সেটিকেও জায়েয মনে করি।

যেসব গবেষক উপরোল্লোখিত আপত্তি উত্থাপন করেন, তারা একথা মেনে নিয়েছেন যে সুদের কারণে বীমা ব্যবসা জায়েয নয় এর দলিলের ব্যাপারে আর কোন আলোচনারই অবকাশ নেই। তাদের দৃষ্টিতে একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা হিসেবে বীমার অবস্থান কি, বীমা কোম্পানিগুলো তাদের ব্যবসা চালাতে গিয়ে কি পদ্ধতি অবলম্বন করে তা জায়েয না নাজায়েয এটা আমাদের ভাবনার বিষয় নয়।

প্রাথমিক আপত্তির জবাব

এর জবাব দু'ভাবে দেয়া যায়।

১. বীমা কোম্পানিগুলো যেভাবে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করে একজন ফকীহ্ তথা ইসলামী আইনজ্ঞ সেভাবেই তার সিদ্ধান্ত দেবেন। সেই সাথে বীমা চুক্তির দ্বারা উভয় পক্ষের মধ্যে যে করণীয় অধিকার ও প্রাপ্যতা নির্দিষ্ট হয় সেই ভিত্তিতে ফকীহগণ সিদ্ধান্ত দেবেন। বীমা পদ্ধতিগতভাবে এমন একটি জনকল্যাণমূলক বাণিজ্যিক ব্যবস্থা যাতে জনস্বার্থকে চিন্তা করে তার নিজস্ব পদ্ধতি প্রয়োগ করে একটি বৈধ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে গণ মানুষকে সংশ্লিষ্ট করার পদ্ধতি ও পলিসি হিসেবে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বীমার মধ্যে কোন ধরনের দূষণীয় কিছু নেই। কিন্তু এতে যে কোন বৈধ অবৈধ মিশেল কিংবা সম্পূর্ণ অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে বীমা ব্যবসা সম্প্রসারণ করার কোন সুযোগ নেই। শরীয়তের দৃষ্টিতে যা হারাম এবং পরিষ্কার সুদের ভিত্তিতে পরিচালিত এমন পদ্ধতি অবলম্বন করে বীমা ব্যবসার অবকাশ ইসলামী শরীয়তে নেই।

মোট কথা, যে কোন বৈধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জরুরি হলো, উদ্দেশ্য সাধনের কর্মপন্থাও বৈধ ও জায়েয পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পাদন করা।

ব্যাংকের মুনাফা ও অর্থ লগ্নি করে মুসলিম উম্মাহর দারিদ্র্যতা নিরসনে ভূমিকা রাখা যায় এজন্য কি কোন ফকীহ্ ব্যাংকের সুদী কারবারকে বৈধতার সার্টিফিকেট দিতে পারবেন? যদিও মুসলিম উম্মাহর দারিদ্র্যতা নিরসনের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে একটি বৈধ ও জায়েয কাজ। সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ একটি জায়েয ও কল্যাণজনক কাজ তাই বলে কি ফসল পাকা কিংবা ফলস পাকার আগেই সেগুলো বিক্রি করে দেয়া অথবা গর্ভজাত পশুর বাচ্চা কিংবা শিকার করার আগেই শুধু জাল নিক্ষেপের পর অআহরিত মাছ ধরার আগেই বিক্রি করাকে বৈধ বা জায়েয বলা সম্ভব?

আপত্তি উত্থাপনকারীরা একথা মেনে নিয়েছেন যে, বীমা কোম্পানিগুলো সুদের ভিত্তিতে পুঁজি বিনিয়োগ করার কারণে হারাম। তাদের এই মত আমাদের কথাকেই সমর্থন করে। কারণ বীমা ব্যবসা যে পদ্ধতিতে চালানো হয় এর ভিত্তিতে সেটি হারাম হওয়াটাই নিশ্চিত। অবশ্য মানুষকে সুনির্দিষ্ট একটা কাজের ভিত্তিতে উপকার করা শরীয়তের মৌলিক চেতনা সম্মত সেটা আমরা অস্বীকার করি না তবে এটার সাথে শরীয়তের মূলনীতি হলো জায়েয কাজের পদ্ধতিটাও জায়েয হতে হবে। অর্থাৎ ধোকা ও সুদ থেকে পবিত্র হতে হবে। কিন্তু বীমা কোম্পানির কার্যক্রমে এই জিনিসটিরই অভাব।

২. আমরা যদি একথা মেনেও নেই যে, সুদী শর্তাবলী থেকে পবিত্র অবস্থায়ও বীমা কার্যক্রম চালানো সম্ভব। এবং বীমা কোম্পানিগুলো সুদী ব্যবসা পরিহার করে শরীয়তসম্মত পন্থায় ব্যবসা করার জন্যও প্রস্তুত। এজন্যই জীবন বীমার ক্ষেত্রে যদি বীমাকারী কিস্তি আদায় করার পরও জীবিত থাকে তাহলে কোম্পানি শুধু কি তাকে সেই পরিমাণ টাকাই ফেরত দেবে যে পরিমাণ কিস্তি সে জমা করেছে। এই প্রদেয় টাকার মধ্যে তারা কোন সুদ নেবে না। সেই সাথে কোন পলিসি-হোল্ডার যতি কোন কিস্তি পরিশোধে বিলম্ব করে তবে বিলম্বের জন্যে জরিমানার নামে সুদ নেবে না এবং সুদের উপর পুঁজি বিনিয়োগ করবে না এবং বীমার ডুকেমেন্টস বন্ধক রেখে সুদের ভিত্তিতে ঋণ দেবে না। মোট কথা এধরনের যাবতীয় সুদী কারবার থেকে বীমাকে পবিত্র করার কথা প্রকৃত পক্ষে আশ্বাসের আশ্বাস মাত্র। কেননা যে ব্যবসার শুরু ও ভিতটাই সুদের উপর রচিত এবং যে ব্যবসার উৎপাদন বন্টন ব্যবস্থাও সুদ ভিত্তিক তাকে সুদমুক্ত করা প্রায় অসম্ভব। যদিও চেষ্টা করা হয় তবুও এই অবস্থায় এর মধ্যে সুদের সংশ্রব থেকেই যাবে। কেননা এসব কোম্পানির প্রবণতাই এমন যে, সুদ ছাড়া এসব কোম্পানির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই দুঃসাধ্য। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে বীমা ব্যবসার ধরনটাই হলো বীমাকারী তথা পলিসি-হোল্ডার একসাথে কিংবা কিস্তি আকারে বীমা কোম্পানিকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেবে এর বিপরীতে বীমা কোম্পানি চুক্তি মতো নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে অথবা উল্লেখিত দুর্ঘটনা ঘটে গেলে একসাথে কিংবা কিস্তিতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বীমাকারীকে দেবে।

এই কিস্তি দেয়া এবং বীমা কোম্পানির কাছ থেকে প্রাপ্ত সুবিধার বিষয়টি একটা অনির্দিষ্ট বিষয়ে হয়ে থাকে। কারণ কখন দুর্ঘটনা ঘটে কিংবা কখন বীমাকারীর মৃত্যু ঘটে তা কেউ বলতে পারে না। এই অনির্দিষ্টতা বীমা থেকে দূর করা সম্ভব নয় কারণ এই সম্ভাব্য আশংকা বা বিপদই তো বীমার মূল উপাদান।

দ্বিতীয় আপত্তি

আপত্তির পটভূমি: বীমা ব্যবসাকে হারাম সাব্যস্ত করার অন্যতম কারণ হলো বীমাকারী ছোট্ট অংকের কিস্তিতে কম টাকা কোম্পানিকে দিয়ে বিরাট দুর্ঘটনা থেকে নিরাপত্তার গ্যারান্টি লাভ করে এবং দুর্ঘটনা ঘটে গেলে আদায়কৃত টাকার চেয়ে অনেকগুণ বেশি টাকা পেয়ে যায়। উল্লেখিত

আপত্তিটা আসলে অনুমান নির্ভর। মূল বিষয়ের সাথে এর খুব একটা সম্পর্ক নেই। কেননা বীমা চুক্তির মূল বিষয় হলো আকস্মিক আপতিত বিপদ বা দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতি সামলে উঠার জন্যে পারস্পরিক সহযোগিতা করা। এর মধ্যে যদি সুদের উপস্থিতি মেনে নেয়া হয় অথবা এতে সুদ রয়েছে এ ধরনের সংশয়কে মেনে নেয়া হয় তাহলে বীমাকারী ও কোম্পানির মধ্যে যে লেনদেন হয়ে থাকে সেটিকেও হারাম সাব্যস্ত করা ছাড়া উপায় থাকে না। কেননা বীমাকারী সামান্য কিস্তি আদায় করে দুর্ঘটনায় কোম্পানির কাছ থেকে মোটা অংকের ভর্তুকি আদায় করে যা সুদের পর্যায়ভুক্ত। আর যদি সুদের অস্তিত্বের ব্যাপারে সংশয়কে মেনে নেয়া হয় তাহলে সরকারী চাকুরীজীবীরা অবসরকালীন সময়ে যে পেনশন পান সেটাকেও সুদ বলতে হয়। তখন পেনশনকেও হারাম সাব্যস্ত করার একটা তাকিদ সৃষ্টি হয়। কেননা সরকার কর্মচারীদের মাসিক বেতন থেকে সামান্য একটা অংশ কেটে রাখে তারপরে সেই কর্মচারী অবসর নিলে কিংবা মৃত্যু ঘটলে তার উত্তরাধিকারগণ এককালীন কিংবা মাসিক ভিত্তিতে একটা বড় অংকের টাকা পায় যা তার বেতনের কর্তৃত অংশ থেকে অনেক অনেক বেশি।

উপরের এই আলোচনার সার কথা দাঁড়ায় বীমা ছাড়া অন্য যে কোন ব্যবসায় অল্প টাকা দিয়ে বেশি টাকা উসূল করা সুদ। কিন্তু বীমার ক্ষেত্রে তা সুদ নয় এবং সুদের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণও নয়। কেননা বীমাটা হয়ে থাকে একটা দুর্ঘটনা কিংবা বিপদ কাটিয়ে উঠার জন্যে পারস্পরিক সহযোগিতার নামে। যেমনটি বিনিময় বীমা কিংবা সরকারী চাকুরীজীবীদের পেনশনের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে।

দ্বিতীয় আপত্তির জবাব

বীমাকারী বীমা কোম্পানির সাথে যে চুক্তি করে সেই চুক্তিকে দুর্ঘটনা কিংবা আকস্মিক আপতিত বিপদ কাটিয়ে উঠার জন্যে পারস্পরিক সহযোগিতার অপর নাম বলে আমরা স্বীকার করি না। কেননা সহযোগিতাটা হয় এক ধরনের অনুদান। অনুদানদাতা গ্রহীতার কাছ থেকে কোন ধরনের স্বার্থ কিংবা আর্থিক লাভালাভের প্রত্যাশা করে না। অথচ বীমা কোম্পানি যে চুক্তি করে এটি একটি আর্থিক লেনদেন এবং কোম্পানি এর দ্বারা আর্থিক লাভ করতে চায়। এতে কারো দ্বিমত নেই। বীমাকারীর কিস্তি বিধিমত পরিশোধ করার শর্তেই কেবল কোম্পানি তাকে দুর্ঘটনায় আর্থিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়। পক্ষান্তরে দুর্ঘটনা বা বিপদে আর্থিক সুবিধা লাভের উদ্দেশেই বীমাকারী কিস্তি পরিশোধ করে। এ ক্ষেত্রে কোম্পানি বা বীমাকারী কারো মধ্যে অনুদান কিংবা দানের বালাই নেই। কোন ব্যবসাকে লেনদেন কিংবা অনুদান বলার ক্ষেত্রে উভয়ের নিয়ত ও উদ্দেশ্য এক হওয়া বাঞ্ছনীয়। বীমার ক্ষেত্রে অনুদানের উদ্দেশ্য টেনে আনা প্রাসঙ্গিক নয়। এ জন্যই তো শরীয়ত যে কোন কাজের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও নিয়তকে মৌলিকত্বের মর্যাদা দিয়েছে। প্রতিটি কাজের পরিণতি নিয়তের উপরেই নির্ভর করে।

বীমা ব্যবসার মধ্যে যে মানবিকতা কিংবা কল্যাণকামিতার কথা প্রচার করা হয় এটি আসলে এক ধরনের কল্পনা মাত্র। সকল বীমাকারীদের মধ্যে যে চুক্তি সাক্ষরিত হয়, সেই চুক্তি অনুযায়ী তাদের

মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক জন্ম নেয় সেই সম্পর্কটি হয় মূলত পারস্পরিক কল্যাণকামিতা ও পরোপকারের জন্য। পারস্পারিক কল্যাণ ও উপকারের নিয়তেই তারা বীমার কিস্তি আদায় করে। যাতে তাদের মধ্যে কেউ আকস্মিক কোন দুর্ঘটনা বা বিপদে আপতিত হলে সেই বিপদের ক্ষয় ক্ষতি সামলে উঠতে পারে। ফলত দুর্ঘটনায় দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি তার কিস্তির বদলা নেয় না বরং তারা সম্মিলিতভাবে যে অনুদান জমা করেছে সেই অনুদান পাওয়ার উপযোগিতায় পতিত হওয়ার সুবাদে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করে। যেমন ইসলামের একটি মূলনীতি হলো, কোন ব্যক্তি যদি বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে পতিত ব্যক্তি গোষ্ঠী কিংবা নির্দিষ্ট গুণে গুণান্বিত কোন জনসমষ্টি বা জনগোষ্ঠীর জন্যে অনুদান দেয়, অত:পর দাতা ব্যক্তি নিজেই যদি অনুদান প্রাপ্তদের পর্যায়ে উপনীত হয় তাহলে পূর্বের দাতাই সেই অনুদান গ্রহণ করতে পারবেন। যেমন কেউ যদি মক্কার অধিবাসীদের জন্যে কিছু সম্পদ ওয়াকফ করে দেয় অথবা শিক্ষার্থীদের ব্যয় নির্বাহের জন্যে ট্রাস্ট গঠন করে, তাহলে দাতা নিজেও সেই সম্পদ থেকে অর্থ গ্রহণ করতে পারবেন যদি তিনি পরবর্তীতে মক্কার অধিবাসী হন কিংবা শিক্ষার্থীতে পরিণত হন। এ ক্ষেত্রে এ কথা বলা যাবে না, সে যা দান করেছিলো এরই বদলা নিচ্ছে সে। বরং বলা হবে পূর্বের অনুদানের বদলা নয় সুবিধা প্রাপ্তির পর্যায়ে উপনীত হওয়ার কারণেই সে পূর্বের দানকৃত সম্পদ থেকে সুবিধা ভোগ করছে। কারণ এখন তার মধ্যে সুবিধা ভোগের গুণাবলী পুরোপুরি বিদ্যমান রয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে দানকৃত সম্পদ থেকে গ্রহণ করা দানের প্রতিদান গ্রহণের পর্যায়ে পড়ে না।

উপরে যে সুদের কথ আলোচনা করা হলো, তা কেবল গ্রুপ বীমা ও সরকারি পেনশন-ভোগীদের বেলায় প্রযোজ্য। কারণ গ্রুপ বীমা ও পেনশন-ভোগীরা কিস্তি আকারে যা আদায় করেন, তা অনুদানের পর্যায়ে পড়ে কিন্তু দুর্ঘটনা কিংবা অবসর কালীন সময়ে তারা যে টাকা গ্রহণ করেন, তা সেই প্রতিষ্ঠানের ক্যাটাগরীতে উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে পেয়ে থাকনে, তাদের উসূলকৃত কিস্তির প্রতিদান হিসেবে নয়।

এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপন করা, এ ধরনের সংগঠন সংস্থা কিংবা প্রতিষ্ঠানগুলোর কিস্তি আদায়ের ক্ষেত্রে দাতাদের মধ্যে অনুদানের যেমন কোন নিয়ত পাওয়া যায় না, উক্ত সংস্থা সংগঠনের নিয়ম নীতিতেও এ ধরনের কোন কথা উল্লেখ নেই, তা ছাড়া এসব সংস্থা প্রতিষ্ঠানের চাদা দানের ক্ষেত্রে অনুদানের নিয়তের কোন অবকাশই নেই?

এ কথার জবাবে আমাদের বক্তব্য হলো, আমরাও ঐসব সংস্থা ও বীমা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে তখন জায়েয বলবো যখন তাদের আদায়কৃত কিস্তির ব্যাপারে অনুদানের কথাটি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকবে অন্যথায় আমরা এ ধরনের আর্থিক লেনদেন বা কারবারকেও না জায়েয বলতে বাধ্য।

সরকারী পেনশনের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। সরকারীভাবে যার ব্যবস্থা হয়ে থাকে। সরকার সেই প্রতিষ্ঠান থেকে কোন স্বার্থের আশা করে না। কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন থেকে যে অংশ কেটে রাখা হয় সেখানে নির্দিষ্ট শর্তে উত্তীর্ণ ব্যক্তির স্বার্থ ও উপকারের বিষয়টিই মূখ্য থাকে। কর্মকর্তা

কর্মচারীর অবসর কিংবা মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারগণ যে টাকা পেয়ে থাকে তা তারা পায় উপকার ভোগীদের পর্যায়ভুক্ত হওয়ার সুবাদে। আমরা পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, পেনশনভাতা কেটে রাখার ফরমে কিংবা রশিদে যদি অনুদান, কল্যাণফান্ড ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ না থেকে থাকে তাহলে অতি অবশ্যই তা উল্লেখ করা উচিত।

কেউ যদি বলেন, কর্মকর্তা কর্মচারীরা বাধ্য হয়ে পেনশন ভাতার কিস্তি পরিশোধ করে থাকেন, স্বেচ্ছায় নয়। আমরা বলবো, না, বাস্তবে এমনটি নয়। পেনশন সুবিধা ভোগ করার জন্যে এবং নিজেও পেনশন ভোগীদের পর্যায়ভুক্ত হওয়ার জন্যে স্বেচ্ছায়ই কিস্তি কর্তনের সম্মতি দেয়, কোন কর্মচারীর কাছ থেকে জোর করে পেনশনের কিস্তি কর্তন করা হয় না। কিস্তি আদায় না করলে সে পেনশন ভোগীদের সুবিধা প্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য হবে না।

আমরা আগেও উল্লেখ করেছি, বীমা কোম্পানি যে ব্যবসায় জড়িত তাদের সাথে পলিসি হোল্ডারদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছাড়া আর কোন সম্পর্ক নেই। যারা বলেন, কোম্পানি ও বীমাকারীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সম্পর্ক গড়ে উঠে বাস্তবে সেটি এক ধরনের কল্পনা মাত্র। কোন কাল্পনিক বা অনুমান নির্ভরতাকে কেন্দ্র করে শরীয়তের বিধান কার্যকর হয় না। জনকল্যাণ ও পরোপকারের নিয়ত যেসব ক্ষেত্রে পরিষ্কার উল্লেখ নেই সেসবে হতে পারে না। বীমা ব্যবসার দলিল পত্রে জনস্বার্থ বা জনকল্যাণের কোন উল্লেখ থাকে না, বস্তুত জনকল্যাণের বিষয়টি পুরোপুরিই অনুমান মাত্র। অনুমানের ভিত্তিতে কোন আইন রচিত হতে পারে না শরয়ী আইনের তো প্রশ্নই আসে না। মোট কথা হলো, বাস্তবতা এড়িয়ে অনুমানের ভিত্তিতে শরয়ী বিধান প্রয়োগের কোন সুযোগ নেই।

দীর্ঘ আলোচনার পর এবিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, বীমা ব্যবসা একটি সম্পূর্ণই বাণিজ্যিক লেনদেন। এর মধ্যে ত্যাগ, অনুদান বা জনকল্যাণের অস্তিত্ব মূখ্য নয়। বস্তুত যেহেতু ব্যাপারটি বাস্তবেও তেমনই তাহলে বিতর্ক দীর্ঘায়িত না করে এটা সবার এক বাক্যে স্বীকার করে নেয়াই ভালো বীমা ব্যবসার মধ্যে সুদের সংশ্রব রয়েছে।

বীমা ব্যবসার সারকথা

এক বীমা ব্যবসাকে বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণের জন্যে যেসব মাধ্যম ও পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় এসব থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যদি বীমাকে একটি বাণিজ্যিক প্রক্রিয়া ও দর্শন হিসেবে দেখা হয় তাহলে তাকে শরীয়তের মৌল বৈশিষ্টের উপযোগী বলেই মনে হয়। কেননা শরীয়ত মূলত জনকল্যাণই কামনা করে। এ প্রসঙ্গে একজন ইসলামী আইন বিশারদ বলেন, বীমা এমন একটি কল্যাণকামী কর্মসূচীর নাম যা অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে সমাজের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে যাদের সবাই এক ধরনের ঝুঁকিতে নিপতিত। যাতে এদের মধ্যে কেউ যদি সে ধরনের বিপদে পতিত হয় তাহলে তাদের সবার সামান্য ত্যাগ স্বীকার বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষয়ক্ষতিকে লাঘব করতে পারে। এই সহযোগিতা না হলে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির হয়তো সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে।

আমাদের মতে এ দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করলে বীমা ব্যবসা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। বিপদাপদে কিংবা দুর্ঘটনায় পতিত ব্যক্তির ক্ষয়ক্ষতি সামলে উঠার জন্যে সামষ্টিকভাবে সহযোগিতার বিষয়টি শরীয়তের দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে নন্দিত কাজ। কিন্তু এই সহযোগিতা ও বিপদ উৎরানোর কর্মপদ্ধতি ও কার্যাবলী নিয়ে আপত্তি রয়েছে। যে পদ্ধতি ও কর্মকৌশল বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত বীমা কোম্পানি অবলম্বন করে থাকে আপত্তিটা তাদের ক্ষেত্রে।

দুই. কোন কাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য জায়েয হলেই সেই উদ্দেশ্য সাধনে যে কোন ধরনের কর্ম কৌশল বৈধ হয়ে যায় না। কারণ শরীয়তের সর্বসম্মত একটি মূলনীতি হলো, যে কোন জায়েয লক্ষ্য অর্জনের জন্যে উপায় উপকরণ ও উপাদানগুলোও জায়েয হতে হবে। কারণ জায়েয লক্ষ্য অর্জনে যদি কোন নাজায়েয বা হারাম প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয় তাহলে নাজায়েয পন্থা পদ্ধতি অবলম্বনের কারণে জায়েয উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যাবে বটে কিন্তু এই অবৈধ বা নাজায়েয পদ্ধতি অবলম্বনের কারণে শরীয়তের কোন মৌলিক বিষয় লঙ্ঘিত বা বিকৃত হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা যতো কাজকে বৈধ করেছেন, সেগুলো অর্জনের জন্যে বৈধ উপায় উপাদান ও প্রক্রিয়া পদ্ধতিও রেখেছেন। কোন ক্ষেত্রে কোন বৈধ লক্ষ্য অর্জনে যদি শরীয়তের পক্ষ থেকে কোন একটি পথ বন্ধ করা হয়ে থাকে অথবা নিষিদ্ধ করা হয়ে থাকে তবে এর বিপরীতে অসংখ্য বৈধ পথ খুলে দিয়েছেন। যেগুলোর দ্বারা শরীয়তের কোন মৌলনীতির লঙ্ঘন হয় না বা বিকৃতি ঘটে না।
উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মজুদদারী ও মোনাফাখুরী দ্বারা আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া আইন সিদ্ধ ও জায়েয কিন্তু এই জায়েয লক্ষ্য অর্জনের কর্ম পদ্ধতি ও কলা কৌশলও জায়েয হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনুরূপ পণ্যের বিনিময়ে পণ্যের কেনাবেচা একটি বৈধ লক্ষ্য কিন্তু এই লক্ষ্য অর্জনের কর্ম পদ্ধতিগুলোও সব ধরনের ধোকা প্রতারণা অস্পষ্টতা সুদ জুয়া ইত্যাদি থেকে মুক্ত হওয়া আবশ্যক।
গণমানুষের জীবনে ঝুকি হ্রাস করা, দুর্যোগ দুর্ঘটনায় তাদের ক্ষয় ক্ষতি লাঘবে পারস্পরিক দায়িত্ববান হওয়া, ত্যাগ স্বীকার করা ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কিন্তু এই ভালো লক্ষ্য অর্জনের জন্য উপায় অবলম্বনগুলোও সব ধরনের সুদ প্রতারণা ও অবৈধতামুক্ত হওয়া উচিত।

তিন. ইসলামী শরীয়তে সাহায্য ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি রয়েছে এগুলো সাধারণ দান, অনুদান, উপহার ইত্যাদির পর্যায়ভুক্ত। এতে ত্যাগ স্বীকারকারী কিংবা সাহায্যকারী তার সাহায্য সহযোগিতার বিনিময়ে কোন ধরনের স্বার্থার্জনের আকাঙ্খা পোষণ করে না। এবং দেয়া অনুদান বা সাহায্যের বিপরীতে কোন ধরনের আর্থিক সুবিধার্জনের ইচ্ছাও পোষণ করে না। এ কারণে দান অনুদান বা সাহায্য সহযোগিতার ক্ষেত্রে ধোকা ও প্রতারণার অবকাশ থাকার এবং অজ্ঞতার পরও তা নাজায়েয নয় এবং এতে সুদও জুয়ার মতো মন্দ জিনিসও কোন প্রভাব ফেলে না। এ জন্য অনুদান সাহায্যের মধ্যে কোন ত্রুটি থাকার কারণে সাহায্য প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি বঞ্চিতও হয় তবে তার কোন ক্ষতি হয় না। কেননা এই সাহায্য প্রাপ্তির জন্যে সে কোন ব্যয় বা আর্থিক ক্ষতি করেনি।

পক্ষান্তরে প্রতিদানমূলক লেনদেনের ক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে টাকা বিনিয়োগ করে যদি প্রতিদান না পায় তাহলে সে আর্থিক ক্ষয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কারণ এ ক্ষেত্রে সে যে অর্থ বিনিয়োগ করে তা বিনষ্ট হয়ে যায়। সুদের ক্ষেত্রে এ কথাই প্রযোজ্য যা জুয়া, অসাবধানতা, ধোকা ও প্রতারণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন সুদদাতা সামান্য টাকা বিনিয়োগ করে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে মোটা অংকের লাভ হাতিয়ে নেয় কিন্তু দান অনুদান কিংবা সাহায্যের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে না। সাহায্যকারী দেয় বটে কিন্তু কিছু গ্রহণ করে না। এজন্য দান অনুদানের ক্ষেত্রে সুদের বিধান কার্যকর হয় না।

চার. ইসলাম সাহায্য সহযোগিতা ও আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের ক্ষেত্রে যে কর্মপদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে সহযোগিতামূলক বীমা গ্রুপবীমার দ্বারা এই উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে। কারণ গ্রুপ বীমা ও সহযোগিতামূলক বীমার মধ্যে আর্থিক স্বার্থার্জনের কোন উদ্দেশ্য থাকে না। জনকল্যাণ ও সহযোগিতার উদ্দেশ্যেই গ্রুপবীমা করা হয়ে থাকে। আমাদের দৃষ্টিতে বীমার ক্ষেত্রে গ্রুপ বীমা ও সহযোগিতামূলক বীমা শরীয়ত সম্মত একটি প্রদ্ধতি।

পাঁচ. সাধারণত বীমা কোম্পানিগুলো সুনির্দিষ্ট কিস্তি গ্রহণের মাধ্যমে যে বীমা পদ্ধতি অবলম্বন করে ইসলাম এই পদ্ধতিকে সমর্থন করে না। কারণ এই ধরনের লেনদেন আর্থিক প্রতিদানমূলক লেনদেনের পর্যায়ে পড়ে, যাতে এক ধরনের অস্পষ্টতা, প্রতারণা, জুয়া ও সুদের সংমিশ্রণ ঘটে। কোন প্রতিদানমূলক আর্থিক লেনদেনে যদি উল্লেখিত উপাদানগুলো বিদ্যমান থাকে তবে তা শরীয়তের নিষিদ্ধ লেনদেনের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে।

বিভিন্ন গবেষক ও চিন্তাবিদগণ প্রচলিত বীমা পদ্ধতির মধ্যে সুদ ধোকা অস্পষ্টতার ব্যাপারটি অস্বীকার করার চেষ্টা করেছেন। প্রচলিত বীমাকে জায়েয সাব্যস্ত করতে গিয়ে তাদের কেউ কেউ বীমাকে অনুদান পর্যায়ে লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, বীমা ব্যবসা হলো বীমাকারীদের সম্মিলিত সহযোগিতামূলক উদ্যোগের একটি ক্ষেত্র। যেখানে বীমাকারীরা সামষ্টিকভাবে সবাই পারস্পরিক সহযোগিতার জন্যে ঐক্যবদ্ধ হয়। এখানে কোম্পানি সকল বীমাকারীর মাধ্যম বা প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করে মাত্র।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, বীমা ব্যবসার মধ্যে কোম্পানির পক্ষ থেকে কোন অস্পষ্টতা নেই। কারণ আধুনিক গাণিতিক পদ্ধতি দ্বারা সম্ভাব্য আয় এবং প্রবৃদ্ধি হিসেব করে কোম্পানি ঠিক বলে দিতে পারে তাদের কতো টাকা কিস্তি আদায় করতে হবে এবং কতো টাকা তাদের পরিশোধ করতে হবে।

কেউ কেউ বীমা ব্যবসার মধ্যেকার অস্পষ্টতা ও প্রতারণার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে গিয়ে বলেছেন, কোম্পানি বীমাকারীকে কিস্তির বিপরীতে যে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয় সেটিতে কোন ধরনের অস্পষ্টতা নেই। কারণ চুক্তির প্রথমেই কোম্পানির পক্ষ থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পায় বীমাকারী। অতএব কিস্তির বিপরীতে মূলত নিরাপত্তা প্রাপ্তিটাই বীমাকারীর মূল লক্ষ্য যাতে ধোকা বা অস্পষ্টতা থাকে না। দুর্ঘটনা ঘটলে তো কোম্পানির কাছ থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধা থেকে সে

ক্ষয়ক্ষতি লাঘব করে নিতে পারে আর যদি দুর্ঘটনা না ঘটে তাহলে তো তার সম্পদ নিরাপদই থেকে যায়। প্রকৃত পক্ষে এসব দাবী ঠুনকো যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাস্তবতার সাথে এসব ধারণার কোন সামঞ্জস্য নেই। রাষ্ট্রীয়ভাবে যদি ইসলামী আইন বাস্তবায়িত হয় তাহলে সমাজের লোকদের পারস্পরিক সহযোগিতা সাহায্য ও সহায়তার বিষয়গুলো এমন শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব; বর্তমান পৃথিবীতে এমন মজবুত ও স্বচ্ছতার দৃষ্টান্ত কোথাও পাওয়া যাবে না।

মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর কর্তব্য হলো, গ্রুপবীমা ও সামষ্টিক বীমা পদ্ধতিগুলোকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতা দিয়ে দেশের সকল নাগরিকদেরকে এর আওতায় নিয়ে আসা। যাতে নাগরিকদের জীবন ও সম্পদ ঝুঁকির আশংকা মুক্ত থাকে। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের প্রত্যেক কর্মক্ষম নাগরিকের জন্য কর্মের সুযোগ করে দেয়া সরকারের কর্তব্য এবং অক্ষম বা অচল নাগরিকদের অন্ন বস্ত্র বাসস্থানসহ মৌলিক চাহিদা পূরণের মতো আর্থিক সাহায্য করাও সরকারের কর্তব্য।

বিভিন্ন গবেষক ফকীহগণ এর জন্য যাকাত সংগ্রহ আদায় ও বণ্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলেছেন। কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, শুধু যাকাত দিয়ে যদি দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জরুরি ব্যয় নির্বাহ সম্পাদন না করা যায়, তাহলে প্রথম শ্রেণীর বিত্তশালীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ট্যাক্স নেয়া যেতে পারে। বীমার উদেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য এবং গণমানুষকে বিপদাপদের ঝুঁকি থেকে নিরাপত্তা দেয়ার জন্যে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা লাভের জন্য গ্রুপ বীমা ও সরকারী কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকৌশল শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয। এগুলোকে আরো ব্যাপক ও সম্প্রসারিত করার জন্যে আধুনিক বিজ্ঞান উদ্ভাবিত সহায়ক উপদান ব্যবহার করা যেতে পারে। বীমার ব্যাপারে বিভিন্ন মুসলিম দেশের বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করা যেতে পারে।

অনুবাদ : আবু শিফা মুহাম্মদ শহীদ

ইসলামী শরীয়তের বিধানের দুটি যৌক্তিক ভিত্তি : ইজমা ও কিয়াস

ডঃ ইউসূফ হামেদ আল আলেম

তৃতীয় দলিল : ইজমা

সংগা ঃ উসূলবিদগণের মতে ইজ্‌মা হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহর জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের কোনো একটি বিষয়ে একমত হয়ে যাওয়া।[১২৮]

একমত অর্থ হচ্ছে, কথায়, কাজে অথবা বিশ্বাসে শরীক হওয়া। আর জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ বলতে বুঝানো হয়েছে শরীয়তের বিধানের ক্ষেত্রে ইজতিহাদকারী মুজতাহিদবৃন্দকে। ইমাম গাযালী বলেছেন, মুজতাহিদদের বদলে সমগ্র উম্মতে মুহাম্মদীয়া। আর কাররাফীর মতে, এই কোনো একটি বিষয় হচ্ছে শরয়ী, বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রচলিত বিষয়। ইমামুল হারামাইন তার 'আল বুরহান' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়াবলীর ওপর ইজমার কোনো প্রভাব নেই।

সেখানে চূড়ান্ত দলিলই নির্ভরযোগ্য। তা একবার দাঁড়িয়ে গেলে কোনো অনৈক্যই তার মোকাবিলায় টেকে না এবং কোনো ঐক্যই তাকে সাহায্য করতে পারে না। ইজ্‌মা নির্ভরযোগ্য হয় শ্রুত বিষয়াবলীর ব্যাপারে। যখন সবাই একমত হয়ে যায় কোনো কাজের ক্ষেত্রে, যেমন কোনো খাদ্য খাওয়া, তখন তাদের এই একমত হওয়াটা এ বিষয়ের প্রতি ইংগিত করে যে, খাদ্যটি মুবাহ ঠিক নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো খাদ্য খাওয়া তার মুবাহ হওয়ার প্রমাণের মতো, যে পর্যন্ত না তার 'মান্‌দুব' অথবা ওয়াজিব হওয়ার কোনো সূত্র পাওয়া যায়।[১২৯]

কাররাফী 'আল মু'তামিদ' গ্রন্থে আবুল হুসাইনের উক্তি বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ তাদের কথা, কাজ ও অনুমোদনের ব্যাপারে ঐকমত্য বৈধ। আর অনুমোদন হবে তাদের নিজেদের ব্যাপারে। কাজেই তারা যে ভালো বিষয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে তাই অনুমোদিত হবে। আবার কখনো তারা কথা ও কাজ পরিহারের ওপর একমত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সেটি ওয়াজিব নয় তাই বুঝা যাবে। আর মানদুব হিসাবে তারা যা পরিহার করে তা বৈধ, কারণ এই পরিত্যাগ ক্ষতিকর নয়।[১৩০]

বলা হয়েছে, ইজ্‌মা হচ্ছে এই উম্মতের বৈশিষ্ট। আর অন্য উম্মতের মধ্যে এটি সাধারণভাবে প্রচলিত। কাযী আবু বকর বাকেল্লানী বলেন ঃ আমি জানিনা অবস্থাটা কেমন ছিল।[১৩১] তবে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই উম্মতের ইজ্‌মা।

লেখক : ড. ইউসুফ হামেদ আল আলেম ছিলেন সুদানের খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ের কুরআন বিভাগের চেয়ারম্যান। মিসরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এ বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭১ সালে প্রকাশিত এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকাভুক্ত তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন গ্রন্থ 'আল মাকাসিদুল আম্মাতু লিশ্ শারীয়াতিল ইসলামীয়াহ' থেকে এ প্রবন্ধটি গৃহীত।

ইজমার সম্ভাবনা ও তার অনুষ্ঠান

এই উম্মতের মুজতাহিদগণের ঐকমত্যই যখন ইজমা তখন এই ঐকমত্য সম্ভব কি সম্ভব নয়, তা একটু বিচার্য বিষয়। আর যখন তা সম্ভব হয় তখন তা বাস্তবে অনুষ্ঠিত হয় কিনা?

একদলের মতে, স্বাভাবিকভাবে ইজমা অনুষ্ঠিত হওয়া একটা অসম্ভব ব্যাপার। অবশ্য অধিকাংশ আলেমের মতে ইজমার অনুষ্ঠান সম্ভব। ইমামুল হারামাইন তাঁর 'বুরহান' গ্রন্থে লিখেছেন: একদল লোকের মতে ইজমার অনুষ্ঠান অকল্পনীয় ব্যাপার। এ ব্যাপারে কাযী কঠোর বক্তব্য রেখেছেন এবং তাদের বক্তব্য নাকচ করে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য খুব কমই ইনসাফের সীমানা অতিক্রম করে গেছে। অতপর ইমামুল হারামাইন বলেছেন: তবে আমরা সকল পক্ষের বক্তব্য গ্রহণ করার পদ্ধতি বের করবো, এমনকি যখন না ও হাঁ-এর সীমানা দেখা যাবে তখন সেখান থেকে সত্যের ধারনা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

যারা ইজমার চিন্তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে তাদের বক্তব্য হচ্ছে, ইসলামের এলাকা অনেক বিস্তৃত হয়ে গেছে। শরীয়তের আলেমগণ বিভিন্ন দেশে এবং অধিকাংশ দূরবর্তী শহরে ছড়িয়ে রয়েছেন। সেখানে খবর পৌঁছাবার কোনো উপায় নেই। এ অবস্থায় কিভাবে বিশ্বের সমস্ত আলেমদের কাছে একটি বিষয় উপস্থাপন করার কথা কল্পনা করা যাবে এবং এ বিষয়ে তাদের মতামত নেয়াও সম্ভব হবে? অথচ তাদের মধ্যে বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রতিভা, প্রজ্ঞা, মযহাব ও উদ্দেশ্য লক্ষ্যের পার্থক্য রয়েছে। যখন তাদের ইজমার কথা চিন্তা করা হবে তখন তাদের মতামতের তাদের থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে পৌনপুনিক বর্ণনা কিভাবে সম্ভব হবে? এ অবস্থায় তাদের বক্তব্যে তিনটি সমস্যা দেখা দেবে : এক, একটি বিষয় পূর্ণাংগ রূপে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অক্ষমতা দেখা দেবে। দুই, তাদের ঐকমত্য কঠিন এবং হুকুম সন্দেহযুক্ত হবে। তিন, নির্ভরযোগ্যসূত্রে পৌনপূনিক মতামত বর্ণনায় অক্ষমতা দেখা দেবে। তারপর তারা একথা বলে এ বিষয়টির ইতি টেনেছেন যে, আলেমদের কেউ যদি কোনো একটি মত পেশ করেন তাহলে অন্যেরা কে তা সমর্থন করবে এবং কে তার নিজের মতের ওপর অবিচল থাকবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

এরপর তাদের বিরুদ্ধে কাযীর সমালোচনা উল্লেখ করেছেন। কাযী বলেন: আমরা দেখছি কাফেরদের একটি প্রজন্মের আক্রমণাত্মক ভূমিকা। মুসলমানদের চাইতে তাদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। তারা গোমরাহীর ব্যাপারে একমত হয়ে গেছে। তাদের বাতিল চিন্তার সামান্যতম জ্ঞানও তারা লাভ করছে। এতে যখন তাদের কোনো বাধা হচ্ছে না তখন দীন ইসলামের অনুসারীদেরও এতে কোনো বাধা হবে না। যদি আমরা শাখা প্রশাখা ও ছোটখাটো বিষয়ের ক্ষেত্রে এ অপরিহার্যতা প্রত্যখ্যান করি, তাহলে আমরা স্থানের পার্থক্য, পরিবর্তন ও দূরত্বের কারণে শাফেয়ী আলেমগণের তাদের মযহাবের বিভিন্ন বিষয়ে ইজমার কথা জানি, এগুলো তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে, এক্ষেত্রে এগুলোকেও তাহলে বাতিল করতে হয়। এরপর কাযী বলেন, মুসলমানদের দেশে অন্য একটি অমুসলিম দেশ তাদের অভিলাস চরিতার্থ করতে পারছে, সেখানে সুস্পষ্টভাবে অনুপ্রবেশ ঘটাতে

পারছে নিজেদের উন্নত মূল্যবোধের এবং আশপাশের দেশগুলোর ওপর নিজেদের ফায়সালা চাপিয়ে দিতে পারছে। এসবগুলো যদি তারা করতে পারে, তাহলে মুসলিম বিশ্বের উলামায়ে কেরামের একটি মজলিসে একত্র হয়ে একটি বিষয়ের আলোচনা করা এবং তার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে মতামত সুস্পষ্ট করা অসম্ভব হবে কেন? এই ধরনের চিন্তা একটি জাজ্বল্যমান সত্য। এটা কোনো বিরল অলৌকিক ঘটনা নয়।

তারপর ইমামুল হারামাইন এ বিতর্কিত বিষয়ে নিজের রায় সুস্পষ্ট করে বলেন, এখন আমরা অগ্রবর্তী প্রয়োজনের জন্য যারা ইজ্মা নিষিদ্ধ মনে করে না তাদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করবো। এরি আওতায় পড়ে মিল্লাতের আকীদা বিশ্বাসের নিয়মগুলোর সাথে সম্পর্কিত প্রত্যেকটি পূর্ণাংগ বিষয়। যদি এ ধরনের বিষয়গুলোর সম্পর্কের ফলে মন মানসিকতার উন্নয়ন ঘটে তাহলে বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা ভাবনা দীনের বড় বড় বিষয়ের আওতাধীন থাকবে। কাযী কাফেরদের ধর্মীয় বিষয়ে একত্র হওয়া সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত করেন তা এরি অন্তরভুক্ত। আবার ইমামের মযহাবের অনুসরণ করার ক্ষেত্রে একমত হয়ে যাওয়াও এরি অন্তরভুক্ত হয়।

যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অনুসরণ করার প্রতি মন আকৃষ্ট হয়। এভাবে সামাজিক ব্যবস্থা গ্রথিত হয়। সকল সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট বিষয়ে এটিই একটি প্রচলিত রীতি। এথেকে কাযী সমগ্র আলেম সমাজের উপস্থিতির কথা চিন্তা করেছেন। এটা কোনো অস্বীকার করার মতো বিষয় নয়। এ অবস্থায় বিভিন্ন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল মহান বাদশাহ্‌র জন্য ঠিক এমন পর্যায়ের যেন তিনি স্বচক্ষে সেখানকার সবকিছু দেখছেন ও শুনছেন। কাজেই সে সম্পর্কে যা বলা হয় তা যা চিন্তা করা হয় তা থেকে ভিন্ন কিছু হয় না।

আর 'যন্নী' হুকুমের ক্ষেত্রে কোনো একক বিষয়ে সবার একত্র সমাবেশ ফরয হওয়ার ব্যাপারটি দীনের পূর্ণাংগ বিষয়গুলোর অন্তরভুক্ত নয়। আলেমগণের বিভিন্ন দূরদেশে পৃথক পৃথক অবস্থান, বিশেষ করে তাদের সমাবেশের উদ্যোগ যেখানে অনুপস্থিত সেক্ষেত্রে সুদৃঢ় ও অপরিবর্তনীয় সংস্কারের আওতায় এটা কল্পনাই করা যায় না।

এক্ষেত্রে ইজ্মার চিন্তা করা বা চিন্তা না করা বড়ই অস্থিতিশীল ব্যাপার। আর বিস্তারিত বক্তব্য যখন ঋনাত্মক বা ধনাত্মক হয় তখন তার একটির নিষিদ্ধ হওয়া অন্যটির সিদ্ধতার প্রমাণ উপস্থাপন করে। আমাদের যুগে ব্যাপকতর উদ্যোগের অভাব সত্ত্বেও কোনো যন্নী বিষয়ে ইজ্মা অনুষ্ঠানের ধারনা গভীর দূরদৃষ্টির পরিচায়ক নয়। সাহাবায়ে কেরামের জামানা পর্যন্ত বড় বড় বিষয়ে ইজ্মা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তখন তাঁদের অবস্থান পরস্পরের নিকটবর্তী ছিল।[১৩৩]

কাযী ও অন্যরা ইজ্মার অনুষ্ঠান ও অননুষ্ঠানের ধারণা সম্পর্কে যে কথা বলেছেন সে ব্যাপারে এটিই হচ্ছে ইমামুল হারামাইনের অভিমত। এই সংগে একক যন্নী বিষয়ের ওপর ইজ্মা সম্পর্কে ইমামুল হারামাইন বলেন, এর অনুষ্ঠান সম্ভব নয়, বিশেষ করে সাহাবায়ে কেরামের জামানার পরে। সাহাবাগণ তাঁদের কাছাকাছি অবস্থানের কারণে তাঁদের যুগের বড় বড় সমস্যার ওপর ইজ্মা অনুষ্ঠানে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে এ প্রশ্ন থেকে যায়: তাঁদের সামনে যে সমস্যা পেশ করা

হয়েছিল এবং যেটি ইজতিহাদী সমস্যার অন্তরভুক্ত ছিল, সে ব্যাপারে ফতোয়া দেবার জন্য কি কার্যত তাঁরা একত্র হয়েছিলেন?

সম্ভবত এর জবাবে বলা হবে, সেযুগে সাহাবাদের মধ্যে এমন অনেক সমস্যা ছিল যেগুলোর ব্যাপারে তাঁদের মতবিরোধ জানা যায় নি। আহকাম সম্পর্কে জানার ব্যাপারে এটিই সাধারণ কথা তবে এক্ষেত্রে তাঁরা একমত হয়ে রায় দিয়েছেন এবং তাঁদের বিরোধী অভিমত নেই, এ দাবী অবশ্যই প্রমাণ সাপেক্ষ।

এ যুগের পরবর্তীকালে ইসলামের বিস্তার ঘটেছে, মুসলিম ফকীহগণ বিভিন্ন দেশে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন এবং পরবর্তীকালের প্রতিভাবান ফকীহগণ, যারা পূর্ববর্তীগণের অনুসারী ছিলেন এবং রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে ব্যাপক বিরোধ সত্বেও যাদের সংখ্যা ছিল অগণিত, তাদের ব্যাপারে আমরা উপরোল্লিখিত ধরনের ইজ্‌মার দাবী করি না, যা আমাদের মন সহজে গ্রহণ করে নিতে পারে। কারণ এযুগে আবার এমন অসংখ্য সমস্যা দেখা দিয়েছে যে ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতবিরোধের কথা জানা যায়নি। ইমাম আহমদের উক্তি এ ব্যাপারটি আমাদের সামনে আরো পরিষ্কার করে দিচ্ছে। তিনি বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি ইজ্‌মার দাবী করে সে মিথ্যুক। সম্ভবত লোকেরা মতবিরোধ করেছে কিন্তু তা সবার কাছে পৌঁছেনি বলে বলা হয়েছে, লোকদের মতবিরোধের কথা আমরা জানিনা।' কোনো কোনো হাম্বলী ফকীহ মনে করেন, ইমাম আহমদ সাহাবা ছাড়া অন্যদের ইজ্‌মার কথা বলেছেন। সাহাবাগনের ইজ্‌মা একটি দলিল এতে সন্দেহ নেই। কারণ তাঁদের সংখ্যা স্বল্প হওয়ার কারণে সেখানে তাদের জমায়েত হওয়ার ধারণা করা যেতে পারে। অন্যদিকে বর্তমানে ফকীহদের সংখ্যা বিপুল এবং তারা ছড়িয়ে রয়েছেন। রাযী বলেনঃ আসলে সাহাবাগণের জামানা ছাড়া অন্য কোনো সময়ে এর যথার্থ রূপ জানার কোনো পথ আমাদের সামনে নেই।[১৩৫]

ইজ্‌মার প্রামাণিকতা

ইজ্‌মা একটি বহুল আলোচিত প্রমাণ এবং উসূলবিদগণের মধ্যে এব্যাপারে বহুতর মতবিরোধ দেখা যায়। এরপরও অধিকাংশ ফকীহর মতে এটি একটি অকাট্য প্রমাণ। অবশ্য নিযাম, শিয়া ও খারেজীগণ এর বিরোধিতা করেন। ইমামুল হারামাইন তাঁর আলবুরহান গ্রন্থে বলেন ঃ সর্বপ্রথম নিযাম ইজ্‌মা প্রত্যাখ্যান করেন। তারপর শিয়াদের একটি গ্রুপ তাঁর পথ অনুসরণ করে। অবশ্য তাদের কেউ কেউ ইজমার প্রমাণ হওয়ার কথাও বলে থাকবেন এবং এর ফলে তিনি তাতে জড়িয়ে পড়েছেন। কারণ তাঁর মতে 'মাসূম' বা নিস্পাপ ব্যক্তির উক্তির মধ্যেই রয়েছে প্রমাণ। এটা শিয়াদের ধারণা। তারা বলে থাকে: ইমামের উক্তিই প্রমাণ এবং এরি ভিত্তিতে তারা দলিল সংগ্রহ করে। [১৩৬]

সমগ্র মুসলিম উম্মাহ ভুল করতে পারে না, এ ধরনের চিন্তার ভিত্তিতে ইজ্‌মার প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠিত করা হয়। অথচ কুরআন ও সুন্নাতে মুতাওয়াতির ছাড়া একে প্রতিষ্ঠিত করার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। কারণ ইজ্‌মার সাহায্যে ইজ্‌মাকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়।

কুরআনের সমস্ত আয়াত চূড়ান্ত অর্থ প্রকাশকারী নয়। যেমন আল্লাহর বাণী : তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে।'[১৩৭]

আল্লাহ্ আরো বলেছেন: 'এভাবে আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী হও।'[১৩৭ক]

আল্লাহ্ আরো বলেন : 'তোমরা সবাই আল্লাহর রশিকে মজবুত করে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।'[১৩৮]

আল্লাহ্ আরো বলেন : 'কারো কাছে সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেবো এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করবো, আর তা কত মন্দ আবাস।'[১৩৯]

এগুলো সবই বাহ্যিক। এগুলোর উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত নয়। শেষের আয়াতটি এব্যাপারে সবচেয়ে শক্তিশালী। এখানে মুমিনদের পথের অনুসরণকে ওয়াজিব করা হয়েছে। এপথের বিরোধিতাকারীকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং এর ফলে এর অনুসরণ ওয়াজিব হয়ে পড়েছে।

ইমাম গাযালীর মতে, আয়াতটি উদ্দেশ্যমূলক নয় বরং বাহ্যিকভাবে নস্ হিসাবে স্বীকৃত। এর অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাঁর বিরোধিতায় উঠে পড়ে লাগে এবং তাঁর অনুসরণ, তাঁকে সাহায্য ও তাঁর প্রতি শত্রুতা নির্মূল করার ক্ষেত্রে মুমিনদের পথ পরিহার করে অন্য পথের অনুসারী হয় তাকে তার পথেই ফিরিয়ে দেয়া হবে, যেন সে কষ্ট পরিহার করার ওপর নির্ভর না করে। শেষ পর্যন্ত তাকে সাহায্য ও সংরক্ষণ করার এবং আদেশ নিষেধের অনুগত থাকার ব্যাপারে মুমিনদের পথ অনুসরণ তার সাথে যুক্ত হয়। বাহ্যত এ অর্থই এখানে উপলব্ধি করা যায়। আর যদি বাহ্যত উপলব্ধি না হয় তাহলে এটিই সম্ভাব্য অর্থ।[১৪০]

আর সুন্নাত সম্পর্কে বলা যায় যে, এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : 'আমার উম্মত কখনো গোমরাহীর ওপর একমত হবে না।'[১৪১]

হাদীসটির শব্দগুলো অধিকতর শক্তিশালী এবং উদ্দেশ্যও অনেক স্পষ্ট। কিন্তু এটি কিতাবের মতো তেমন অকাট্য ও নির্ভরযোগ্য নয়। আর কিতাব অকাট্য ও নির্ভরযোগ্য নসের ভিত্তিতে নয়। কাজেই এক্ষেত্রে প্রমাণ প্রয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কে এভাবে বলা যায়, এ উম্মতের ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিভিন্ন শব্দ যোগে হাদীস বর্ণিত হলেও এগুলোর অর্থের মধ্যে অভিন্নতা আছে।

উমর ইবনে মাসউদ, আবু সাঈদ খুদরী, আনাস ইবনে মালেক, ইবনে উমর ও আবু হুরাইরা রিদওয়ানুল্লাহ আলাইহিম আজমায়ীন প্রমুখগণের ন্যায় শ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য সাহাবাগণ বর্ণিত হাদীস থেকে একথা বহুল পরিচিতি লাভ করেছে। যেমন তাদের বর্ণিত হাদীসগুলোতে বলা হয়েছে : "আমার উম্মত গোমরাহীর ওপর একমত হবে না।'

'আল্লাহ কখনোই আমার উম্মতকে গোমরাহীর ওপর ঐক্যবদ্ধ করবেন না।'

'আমি আল্লাহর কাছে আবেদন করলাম আমার উম্মতকে গোমরাহীর ওপর ঐক্যবদ্ধ না করতে। তিনি আমার আবেদন গ্রহণ করলেন।'

'জামায়াতের সাথে রয়েছে আল্লাহর হাত।'

' 'যে ব্যক্তি দলছুট হয়ে যায় আল্লাহর তার কোনো পরোয়া নেই।' এ অর্থে এ ধরনের আরো বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে।'[১৪১ক]

এ বর্ণনা সাহাবা, তাবেয়ী ও পরবর্তী লোকদের মধ্যে পরিচিতি লাভ করেছেন এবং উম্মতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বর্ণনাকারীদের মধ্য থেকে একজনও এর প্রতিবাদ করেননি। বরং উম্মতের পক্ষ-বিপক্ষ সকল গ্রুপের কাছেই তা জনপ্রিয় হয়েছে। দীনের মূলনীতি ও খুঁটিনাটি বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ সব সময় এর মুখাপেক্ষী হয়েছে এবং এটি তার স্থায়ী স্বভাবে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন যুগে মুসলিম উম্মাহ একযোগে একথা স্বীকার করে নিয়েছে যে, যেখানে স্বভাব প্রকৃতি বিভিন্ন এবং শক্তি-সামর্থ ও গ্রহণ বর্জনের মতামতের ক্ষেত্র পার্থক্য ও ব্যবধান রয়েছে সেখানে সম্মতির নির্ভুলতার প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর একারণেই খবরে ওয়াহিদের মাধ্যমে তার বিরোধীর বিরোধিতায় এবং তার মধ্যে সন্দেহ প্রকাশের ব্যাপারে হুকুম প্রমাণিত হয় না।[১৪২]

সারকথা হচ্ছে, বিভিন্ন যুগে উম্মতে মুসলিমা ইজ্‌মাকে চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে নির্ধারণ করেছে এবং নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামও একে আইন প্রণয়নের নির্ভরযোগ্য ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এমনকি প্রত্যেক যুগের ফকীহগণ পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণের রায় অস্বীকারকারীদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। আসলে তাঁদের এ ধরনের একাত্মতা নিছক অনুমানের ভিত্তিতে ছিলনা বরং তাঁদের কাছে এর সপক্ষে চূড়ান্ত ও অকাট্য দলিল ছিল।

আর ইজ্‌মার ওপর আমল করা তার বর্ণনা পরম্পরা জানার ওপর নির্ভরশীল নয়, যদিও কোনো কোনো ফকীহ বলেন, ইজ্‌মার যুক্তি বা নিদর্শনের বর্ণনা অবশ্যই নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পরম্পরায় আসতে হবে। কারণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনা ছাড়া ভুল অবশ্যম্ভাবী। আবার অনেক ফকীহ একথা ভাবেননি।[১৪৩]

বিষয়টি যার কাছে হস্তান্তর করা হয় তার পক্ষে ইজ্‌মা হচ্ছে চূড়ান্ত ও অকাট্য নসের মতো। এ ব্যাপারে বিবেচনা করার কোনো অবকাশই নেই। বরং কোনো প্রকার বর্ণনা বা ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে তার ওপর আমল করা ওয়াজিব। তবে কোনো কোনো ফকীহর মতে, ইজ্‌মার প্রমাণ হওয়া দলিল বা সনদের ওপর নির্ভরশীল নয় বরং উম্মতের জন্য তার মর্যাদাপূর্ণ সত্তার এবং শরীয়তের আহকামের স্থায়ীত্বের কারণেই তা প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত।[১৪৪]

ইজ্‌মা সংক্রান্ত আর একটি আলোচনা আছে, যা বিপুলভাবে আলোচিত। সে প্রসংগে যাবার ইচ্ছা আমাদের নেই। কারণ আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, শরীয়তের শ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য আলেমগণ যে একে

শরীয়তের নির্ভরযোগ্য দলিল গণ্য করেন একথা বিবৃত করা। কাজেই এর প্রকারভেদ, শ্রেণীভেদ ও মুজতাহিদগণের শর্তাবলী ইত্যাদি বিষয়াবলী ইজ্‌মা সংক্রান্ত এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় স্থানলাভের আওতার বাইরে থেকে যায়।

চতুর্থ দলিল : কিয়াস

এর আভিধানিক অর্থ সমান করা। বলা হয়ে থাকে: দুটি বিষয়ে যখন সামঞ্জস্য আছে তখন একটিকে অন্যটির ওপর কিয়াস করো। শরীয়তের দৃষ্টিতে : হুকুমের ক্ষেত্রে মূলের সাথে শাখার যে সমতা তাকে বলে কিয়াস। কাজেই এটা হচ্ছে শব্দকে তার কতক নামের ভিত্তিতে বিশেষত্ব দান করা। যেমন দুনিয়ার কোনো এলাকার মালবাহী পশুর মধ্য থেকে কোনো বিশেষ নামের পশুকে বিশেষত্ব দান করা।

কিয়াসের সংগা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে উসূলবিদগণের বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিয়েছে। তাঁদের প্রত্যেকেই বিপক্ষের যাবতীয় আপত্তির জবাব দিয়ে নিজের সংগাকে পূর্ণাংগ রূপ দিয়েছেন। এজন্য আমরা দেখি ইমাম গাযালী তাঁর শিফাউল গালীল গ্রন্থে এর দুটি সংগা দিয়েছেন। একটি সংগার বক্তব্য হচ্ছে, কিয়াসের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা এবং দ্বিতীয় সংগার বক্তব্য হচ্ছে, কিয়াসের সংগার বিরুদ্ধে উত্থাপিত যাবতীয় আপত্তির জবাব দেয়া।

তিনি বলেন : কাংখিত উদ্দেশ্যাভিমুখে সুস্পষ্ট বক্তব্য এভাবে উপস্থাপন করা যায়। কিয়াস বলা হয় শাখার মধ্যে মূলের হুকুম প্রমাণ করাকে। এভাবে হুকুমে ইল্লাত তথা কার্যকারণের মধ্যে তাদের উভয়ের অংশ গ্রহণ হয়। অতঃপর তিনি বলেন: বর্ণনার ক্ষেত্রে এতটুকু মূল্যমানই যথেষ্ট। কিন্তু মুতাকাল্লিম ও ন্যায়শাস্ত্রবিদদের বক্তব্যে যে সব আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে যদি আপনি সেগুলো থেকে মুক্ত হয়ে কোনো বক্তব্য পেশ করতে চান তাহলে আমি বলবো : এটা হচ্ছে গুণের মধ্যে অংশগ্রহণ অথবা গুণ নির্বাচন করে হুকুমকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক করার ক্ষেত্রে পরিচিত জিনিসের উপর পরিচিত জিনিসকে উপস্থাপন করা। তারপর তিনি বলেন : সকল ধরনের বক্তব্যের জন্য এটি উপযোগী এবং এর সবদিক একত্রকারীও। প্রথমটিই আমাদের চাহিদা মুতাবিক বর্ণনায় সমৃদ্ধ। তাতে কিয়াসের অর্থ বর্ণিত হয়েছে এবং তা হুকুমের কার্যকারণের বর্ণনা সমন্বিত। এক কথায় বলা যায়, কিয়াস করা হয় দুটি জিনিসের মধ্যে সমতা নির্ণয়ের জন্য।[১৪৫]

কাজেই কিয়াসের সংগা হচ্ছে : যে বিষয়ে কোনো নস্ নেই শরীয়তের হুকুমের মধ্যে যার জন্য নস্ রয়েছে সেই হুকুমের কার্যকারণে তাদের উভয়কে শরীক করে সেই বিষয়ের সাথে তাকে সংশ্লিষ্ট করা।

এই সংগা থেকে তার চারটি মূল স্তম্ভ নির্ণীত হয় :

এক, যার উপর কিয়াস করা হয়। আর সেটি হচ্ছে এমন একটি ঘটনা যার হুকুম বর্ণনা করার জন্য নস্ আরোপিত হয়েছে এবং তাকে আসল আখ্যা দেয়া হয়।

দুই, যাকে কিয়াস করা হয়। আর এটি হচ্ছে এমন একটি ঘটনা যার হুকুম বর্ণনা করার জন্য নস্ আরোপিত হয়নি এবং তাকে ফারা' বা শাখা বলা হয়।
তিন, শরীয়তের এমন হুকুম যার সাথে মূলত নস্ সংশ্লিষ্ট হয় এবং তা থেকে তার শাখার দিকে ফেরার অর্থ নেয়া হয়।
চার, ইল্লাত বা কার্যকারণ। এটি হচ্ছে একটি সংহত প্রকাশিত গুণ, যা হুকুমের মূল থেকে শুরু করেছে এবং শাখার মধ্যে অস্তিত্ব লাভ করেছে।

কিয়াসের রূপরেখা

যেমন বলা হয়ে থাকে : হাদীসে বলা হয়েছে হত্যাকারী উত্তারাধিকার স্বত্ব লাভ করে না। এ হাদীসটির হুকুম প্রমাণ করে যে, হত্যাকারীর জন্য নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকার লাভ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটি হচ্ছে ঘটনা। মুজতাহিদ তাঁর ইজতিহাদের মাধ্যমে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান যে, এ হুকুমের সাহায্যে শরীয়ত প্রণেতার কাংখিত 'মাসলিহাত' হচ্ছে ঃ সময়ের পূর্বে কোনো বিষয়কে ত্বরান্বিত করা থেকে বিরত রাখা এবং অপরাধীকে তার অপরাধ কর্মের লাভ থেকে বঞ্চিত করা। এ থেকে মুজতাহিদ প্রকাশ্য কার্যকারণ নির্ণয়ে সক্ষম হন এবং শরীয়ত প্রণেতাই সেটিকে এর সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন আর সেটি হচ্ছে হত্যা। কারণ হত্যা প্রতিরোধের সাথে ঐ মাসলিহাত সম্পাদনের সম্পর্ক রয়েছে।

এখন তার জন্য অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির তথা অসিয়তকারীর হত্যাকারীর ঘটনা সামনে আনা হলো। মুজতাহিদ দেখলেন, তার মধ্যে যে হুকুম আছে সেই একই হুকুম দেয়া হয়েছে হত্যাকারী উত্তরাধিকারীর ব্যাপারে। শরীয়ত প্রণেতা সেখানে মাসলিহাত সম্পাদন করেছেন। অসিয়তপ্রাপ্ত তথা অসিয়তকারীর হত্যাকারীকে হুকুমের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট করেছেন। উত্তরাধিকারী তথা উত্তরাধিকার দাতার হত্যাকারীর সাথে তাদের উভয়কে কার্যকারণে সমানভাবে শামিল করার জন্য। আর এভাবে উত্তরাধিকার দাতার হত্যাকারীর উত্তরাধিকার নিষিদ্ধ হয়ে যাবে নসের সাহায্যে। এটি একটি ঘটনা, যাকে নসের ওপর আরোপ করা হয়েছে। আর অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি তথা অসিয়তকারী হত্যাকারীর জন্য উত্তরাধিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে কিয়াসের ভিত্তিতে। এটি এমন একটি ঘটনা নস্ যার হুকুম প্রত্যাখ্যান করেনি।[১৪৬]

নস্ থেকে যে ঘটনার হুকুম নির্ণীত হয়েছে তার কার্যকারণ নির্ণয়ের মাধ্যমে কিয়াসের কার্যক্রম শুরু হয়। উসূলবিদগণ এই কার্যক্রমকে 'তাখরীজ' তথা নিষ্পন্ন নামে অভিহিত করেছেন। তারপর এই কার্যকারণকে এমন একটি ঘটনার মধ্যে প্রয়োগ করার আলোচনা চালিয়েছেন যার পক্ষে কোনো নস্ নেই। এর নাম দেয়া হয়েছে 'তাহকীক' অর্থাৎ প্রয়োগ। এটি এমন একটি কার্যকারণের প্রয়োগ শাখা তথা খুঁটিনাটি বিষয়ে যে কার্যকারণ সম্পর্কে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারপর এই হুকুমটি এমনভাবে অনুবর্তী হয়েছে যার ঘটনা দুটি কার্যকারণের মধ্যে সমান পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। আর এরি ওপর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে হুকুমের মধ্যে দুটি ঘটনার সমতা বিধানের। এটিই কিয়াসের উদ্দেশ্য।

কিয়াসের প্রামাণিকতা

শরীয়তের নির্ভরযোগ্য আলেমগণের নিকট এটি একটি দলিল। ইবনে হাযম[১৪৮] এর ন্যায় যাহের পন্থী ও খারেজীগণ অবশ্য একে শরীয়তের বিধানের জন্য দলিল মনে করেন না। কারণ তাদের মতে মানব জীবনের সমস্ত ঘটনা আভিধানিক অর্থে নসের অন্তরভুক্ত রয়েছে এবং এজন্য কোনো কিয়াস ও ইজতিহাদের প্রয়োজন নেই। আর দাউদ ইসফাহানী অনুচ্চ কণ্ঠে কিয়াস নিষিদ্ধ করার কথা বলেন।[১৪৯]

অন্যদিকে কিয়াসের প্রবক্তাগণ কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবাগণের ইজ্‌মা থেকে কিয়াস প্রমাণ করেছেন।

কুরআন থেকে কিয়াসের প্রমাণ হচ্ছে, মহান আল্লাহ বলেন : 'হে চক্ষুষ্মানরা উপদেশ গ্রহণ করো।' এই আয়াত থেকে দলিল গ্রহণ করার কারণ হচ্ছে 'উপদেশ গ্রহণ করো' বাক্যাংশটি। আরবীতে ইতিবার বা উপদেশ গ্রহণ করা শব্দের অর্থ হচ্ছে, কোনো বস্তুকে তার নজিরের ওপর স্থাপন করা। অথবা এটি ইব্‌রাত ও উবূর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হয় সুস্পষ্ট করা। কিংবা এটি উবূর এর ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হয় স্থানান্তর ও অতিক্রম করা। আর এই তিনটি অর্থেই কিয়াস ব্যবহৃত হয়। 'পূর্ণ' ব্যবহৃত হয় 'অংশে'র ওপর। এর মধ্যে শাখা তার অনুরূপ কার্যকারণের সাহায্যে অনুরূপ হুকুম প্রমাণ করার ক্ষেত্রে মূলের দিকে ফিরে আসে। আর মূলের কার্যকারণের অনুরূপ শাখার হুকুমকে সুস্পষ্ট করে এবং মূলের হুকুম অতিক্রম করে শাখার দিকে যায়। এভাবে সব ধরনের কিয়াসই উল্লেখিত বিষয়ের অধীন হয়।[১৫০]

এখানে আরো আয়াতও উপস্থাপন করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন : 'এরপর যদি কোনো ব্যাপারে তোমাদের মতবিরোধ হয় তাহলে তাকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।' বলা হয়ে থাকে, এখানে 'রদ্দুন' শব্দের মাধ্যমে যে অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে তার তাৎপর্য হচ্ছে কিয়াস করা। কারণ এখানে এমন শাখাকে ফিরানো হচ্ছে যার পেছনে কোনো নস্ নেই এবং তাকে এমন মূলের দিকে ফিরানো হচ্ছে যার পেছনে নস্ আছে। আর এই নস্ হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত।[১৫১]

এতো গেলো কুরআন থেকে কিয়াসের প্রমাণ। অন্যদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতে বিভিন্নভাবে এর অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন তিনি উমরকে রা. বললেন, যখন উমর রোযা রাখা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন: 'যখন তুমি পানি নিয়ে কুল্লি করো তখন কি তুমি তা পান করো?' এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লাম কুল্লি করার পরে যখন পানি পান করা হয় না তখন তাকে চুম্বনের সাথে তুলনা করেছেন যার পরে স্ত্রী সংগম করা হয় না, উভয় স্থানেই মূল উদ্দেশ্য সম্পাদন করা হয় না অর্থাৎ পানি পান ও স্ত্রী সংগম করা। এটিই হচ্ছে যথার্থ কিয়াস। খাছআমী মহিলাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছিলেন তা থেকেও কিয়াসের ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন: 'যদি তোমার বাপের ওপর ঋনের বোঝা থাকতো, তাহলে তুমি কি তা আদায় করতে? জবাবে মহিলা বললেন: হ্যাঁ। তিনি বললেন: তাহলে আল্লাহর ঋণ তো সর্বাগ্রে পরিশোধযোগ্য।' এটি হচ্ছে যথার্থ কিয়াস।[১৫২]

তবে এ ব্যাপারে সর্বাধিক পরিচিত হচ্ছে মুআয ইবনে জাবালের হাদীস। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামনে পাঠাচ্ছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : 'তুমি কিভাবে সমস্যার সমাধান করবে? জবাব দিলেন: মহান আল্লাহর কিতাবের সাহায্যে। জিজ্ঞেস করলেন: যদি সেখানেও কোনো সমাধান না পাও? জবাব দিলেন: তাহলে ইজতিহাদ করে আমার রায়ের ভিত্তিতে সমাধান করবো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর রসূলের প্রেরিতকে তাঁর রসূলের ইচ্ছানুসারী করেছেন। এখান থেকে বুঝা যায়, কিয়াস যদি দলিল না হতো তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআযের রায় অস্বীকার করতেন। এবং যখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন তখন এ থেকে বুঝা গেলো কিয়াস একটি দলিল।[১৫৩]

সাহাবাগণের অবস্থা ও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে জানা যায়, তাঁরা কিয়াসের ওপর আমল করেছিলেন। উমর ইবনুল খাত্তাব আবু মূসা আশআরীকে পত্র লিখেছিলেন। তাঁকে বলেছিলেন: সামঞ্জস্যশীল বিষয় ও নজিরগুলো চিহ্নিত করুন। তারপর আপনার মনকে যা নাড়া দেবে তাকে সংশ্লিষ্ট করুন তার অনুরূপ বিষয়ের সাথে যথাযথভাবে। আর আসলে এটিই হচ্ছে কিয়াস। ইবনে আকীল হাম্বলী বলেছেন: সাহাবাগণ কিয়াসের ওপর আমল করেছিলেন, একথা সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য পরোক্ষ বর্ণনা পরম্পরায় জানা গেছে। এটিই চূড়ান্ত সত্য কথা। সফীউল হিন্দী বলেছেন: ইজমার দলিল হচ্ছে, গবেষক উসূল বিদগণের অধিকাংশই এর ওপর আমল করেছেন। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী তাঁর 'আল মাহসূল' গ্রন্থে বলেছেন: উসূলবিদগণের অধিকাংশই ইজমার ওপর নির্ভর করেছেন। ইবনে দাকীকুল ঈদ বলেছেন: সমগ্র পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে যুগ যুগ ধরে মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর অংশ কিয়াসের ওপর আমল করে এসেছে। এটিই এর পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী দলিল। পরবর্তী আলেমদের মধ্য থেকে ব্যতিক্রমী দু' একজন ছাড়া কেউ একে অস্বীকার করেননি।[১৫৪]

উপরোক্ত দলিলগুলোর ভিত্তিতে আলেমগণের বৃহত্তম অংশ কিয়াসকে দলিল ও প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করে একে শরীয়ী আইন প্রণয়নের উৎস এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের অন্যতম মনে করেছেন। যেসব সমস্যার ক্ষেত্রে কোনো নস্ নেই সেগুলোর ব্যাপারে বিধান উদ্ভাবন করার জন্য মুজতাহিদকে প্রথম পদ্ধতি হিসাবে এই কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। এটি ইজতিহাদের অন্যান্য পদ্ধতিগুলোর মধ্যে সুস্পষ্টতর। বিশেষ ইজতিহাদের মধ্যে এটি গণ্য। আবার কখনো একে যার জন্য কারণ নির্ধারণ করা হয়েছে তার ওপর কার্যকারণ আরোপ করার কারণে পরোক্ষ ইজতিহাদ নামে অভিহিত করা হয়। কারণ কিয়াস ইজতিহাদের মুখাপেক্ষী। এটি তার জন্য অপরিহার্য। কিন্তু ইজতিহাদ কিয়াসের মুখাপেক্ষী নয়। কারণ বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে শরীয়ত ভিত্তিক নির্ভরযোগ্য উপাদানের সাহায্যে কিয়াস বা অন্য কিছুর মাধ্যমে সত্য সন্ধানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর নাম ইজতিহাদ। অধিকাংশ আলেম এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। এই সংগে তাঁরা এও বলেছেন যে, এ দুটি একই জিনিস। এ উক্তিটিকে ইমাম শাফেয়ী রাহেমাহুল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে।[১৫৬]

১২৮. কাররাফী, তানকীহুল ফুসূল, ১৪০ পৃষ্ঠা, মুস্তাসফা, ১ খণ্ড, ১৭৩ পৃষ্ঠা, ইবনুল হাজেব লিখিত আল মুন্তাহা, ৩৭ পৃষ্ঠা, আমাদী লিখিত আল আহকাম, ১ খণ্ড ১০১ পৃষ্ঠা।

১২৯. মাকতাবা আযহার সংকলিত আল বুরহান, ৯১৩ নং পান্ডুলিপি।

১৩০. তানকীহুল ফুসূল, ১৪১ পৃষ্ঠা।

১৩১. তানকীহুল ফুসূল।

১৩২. মাকতাবা আল আযহার প্রণীত আল বুরহান, ৯১৩ নং পান্ডুলিপি।

১৩৩. মাকতাবা আল আযহার প্রণীত আল বুরহান, ৯১৩ নং পান্ডুলিপি।

১৩৪. ইমাম আহমদ ইবনে হামবাল আবু আবদুল্লাহ আশ শাইবানী। হাম্বলী মযহাবের ইমাম। অত্যন্ত পরিশ্রমী ও সবরকারী। ১৬৪ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৪১ হিজরীতে সেখানেই ইন্তিকাল করেন।

১৩৫. উসূলুল খিদরী, ৩১৩-৩১৪ পৃষ্ঠা।

১৩৬. মাকতাবা আল আযহার প্রণীত আল বুরহান, ৯১৩ নং পান্ডুলিপি দেখুন।

১৩৭. সূরা আলে ইমরান, ১১০ আয়াত।

১৩৭ক. সূরা আল বাকারা, ১৪৩ আয়াত।

১৩৮. সূরা আলে ইমরান, ১০৩ আয়াত।

১৩৯. সূরা আল নিসা, ১১৫ আয়াত।

১৪০. আল মুসতাফা, ১ খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা, আল হুজ্জীয়াতুল আহকাম, ১ খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা, রওদাতুন নায়ের, ৬৭ পৃষ্ঠা, আলী ইবনুল হাজেব লিখিত শারহুল আদুদ, ৩ খন্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা।

১৪১. ইবনু মাজা ও তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন।

১৪১ক. আল মুস্তাস্‌হবা ১ খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা।

১৪২. উসূলুল খিদরী, ৩১৬ পৃষ্ঠা।

১৪৩. আলী ইবনুল হাজেব, শারহুল আদুদ, ২ খন্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা এবং আমাদী, ১ খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা।

১৪৪. তালবীহ এর উপর লিখিত আল গুযীর হাশীয়া, ২ খন্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা।

১৪৫. শিফাউল গালীল, ১১-১২ পৃষ্ঠা আল মুস্তাস্ফা, তারীফুল কিয়াস, ২ খন্ড, ২২৮ পৃষ্ঠা জামউল জাওয়ামে, ২ খন্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা আল মু'তামিদ, ২ খন্ড, ৬৯৭ পৃষ্ঠা আল ইহকাম, ৩ খন্ড, ২৬১ পৃষ্ঠা ইবনুল হাজের, শারাহ মুখতাসার, ২ খন্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠা বায়যাবী, কাশফুল আসরার, ৩ খন্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা। কাররাফী তানকীহুল ফসূল, ১৬৫ পৃষ্ঠা। রওদাতুন নাযের ২ খন্ড, ২২৬ পৃষ্ঠা। শারাহ মুসাল্লামুস সুবুত, ২ খন্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা। নিবরাসূল উকুল ৯-৪৬ পৃষ্ঠা। আল মিরাআতু ফিল উসূল, ২ খন্ড, ২৭৫ পৃষ্ঠা।

১৪৬. কাররাফী, তানকীহুল ফুসূল, ১৬৮ পৃষ্ঠা। জামউল জাওয়ামে আত্তারের হাশিয়াসহ, ২ খন্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা আল মিরআতু ফিল উসূল, ২ খন্ড, ২৮২ পৃষ্ঠা, শায়খ আবদুল ওহহাব খাল্লাফ, মাসাদিরুত তাশরী ফীমা লা নাস্‌মা ফীহ, ১৬-১৭ পৃষ্ঠা।

১৪৭. কাররাফী, তানকীহুল ফুসূল, ১৬৮ পৃষ্ঠা। জামউল জাওয়ামে আত্তারের হাশিয়াসহ, ২ খন্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা আল মিরআতু ফিল উসূল, ২ খন্ড, ২৮২ পৃষ্ঠা, শায়খ আবদুল ওহহাব খাল্লাফ, মাসাদিরুত তাশরী ফীমা লা নাস্‌মা ফীহ, ১৬-১৭ পৃষ্ঠা।

১৪৮. ইবনে হাযম ছিলেন আন্দালুসিয়ার ফকীহ। তিনি কর্ডোভার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবু মুহাম্মদ আলী ইবনে সাঈদ ইবনে হাযম। ৪৫৬ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। যারকাবী লিখিত 'আল আ'লাম' গ্রন্থ ৫৪-৫৯ পৃষ্ঠা এবং শায়খ আবু যোহরা লিখিত ইবনে হাযম গ্রন্থটি দেখুন।

১৪৯. আত্তারের হাশিয়াসহ জামউল জাওয়ামে' ২ খণ্ড ২৪২ পৃষ্ঠা এবং আল মিরআহ, ২ খন্ড, ২৮২ পৃষ্ঠা দেখুন।

১৫০. সূরা আল হাশর, ২ আয়াত। আল মিরআতু, ২ খণ্ড ২৭৮ পৃষ্ঠা। তানকীহুল ফুসূল, ১৬৬ পৃষ্ঠা। উসূলুস সারাখশী

১৫১. সূরা আননিসা, ৫৯ আয়াত। তাফসীর ফখরুর রাযী, ৩ খন্ড, ২৪১- ২৪২ পৃষ্ঠা।

১৫২. তানকীহুল ফুসূল ১৬৬ পৃষ্ঠা।

১৫৩. মিরআতুল উসুল, ২ খন্ড, ২৮১-২৮২ পৃষ্ঠা

১৫৪. তাফসীর আল মানার থেকে স্বতন্ত্রভাবে উসুল আত্ তানাবীউল আম, পৃষ্ঠা ৬৭ দেখুন।

১৫৫. উসলুল বাযদবী, ৩ খন্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা।

১৫৬. জাম উমাবুর সাফেয়ী মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস ইবনে উসমান আল হাশেমী আল মুত্তালিবী। ১৫০ হিজরীতে গাযায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ইন্তিকাল করেন কায়রোয় ২০৪ হিজরী সনে। তিনিই প্রথম উসূলুল ফিক্‌হ রচনা করেন। তাঁর আর রিসালা নামক কিতাবটি সবচেয়ে পুরাতন কিতাব বিবেচনা করা হয় এবং ইসলামী ফিকহের উসূল সংক্রান্ত কিতাবটির মধ্যে এটিকে সর্বপ্রথম কিতাব বলা হয়। তারীখে বাগদাদ ২ খণ্ড ৫৬ পৃষ্ঠা, হুলিয়াতুল আউলিয়া ৯ খণ্ড ৬৩ পৃষ্ঠা, তাবকাতুশ শাফেয়ীয়া ১ খণ্ড ১৮৫ পৃষ্ঠা, ইবনে হাজেমের আদাবুশ শাফেয়ী ওয়া মানাকিবুহু, আমাদের উস্তায শায়খ আবদুল গণী আবদুল খালেকের গবেষণা এবং রাযীর মানাকিবুশ শাফেয়ী গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ ঃ আবদুল মান্নান তালিব

ইসলামী দণ্ডবিধি

ড. আবদুল আযীয আমের

॥ চার ॥

ইসলামী শরীয়তে সুনির্দিষ্ট আইনের কিছু দায় ও বৈশিষ্ট

এর আগের আলোচনায় আমরা এ বিষয়টি পরিষ্কার করেছি যে, ইসলামী শরীয়াহ্ সুনির্দিষ্ট মাত্র কয়েকটি অপরাধের শাস্তি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। যেসব অপরাধের শাস্তি সুনির্ধারিত এগুলোকে শরীয়তের পরিভাষায় 'হুদুদ' ও 'কাসাস' বলে অভিহিত করা হয়। এই দণ্ডগুলোর প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র। উল্লেখিত অপরাধগুলোর ক্ষেত্রে শাস্তি বা দণ্ডাদেশ এক ও অভিন্ন। কোন অপরাধে দু'ধরনের শাস্তি নেই। আসল কথা হলো, বিচারক বা কাজির কাছে যদি এসব অপরাধের মধ্যে কোন অপরাধ সাব্যস্ত হয়ে যায় তাহলে সেই অপরাধের জন্যে অপরাধীকে নির্দিষ্ট দণ্ডে দণ্ডিত করা বিচারকের জন্যে অপরিহার্য। বিচারক এসব অপরাধের শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন ধরনের হ্রাস বৃদ্ধি করতে পারবেন না। বিশেষ কোন অবস্থার প্রেক্ষিতেও বিচারক শাস্তির ক্ষেত্রে লঘু গুরু করতে পারবেন না। অপরাধের ধরন কিংবা অপরাধীর অবস্থা বিবেচনা করেও বিচারক শাস্তির ক্ষেত্রে কোন ধরনের হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারবেন না। বর্তমানে প্রচলিত বিচার কার্যে বিচারকের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অপরাধ ও অপরাধীর পরিবেশ পরিস্থিতি ও কার্যকারণের যথেষ্ট প্রভাব থাকে কিন্তু ইসলামী আইনে হুদুদ ও কাসাসের ক্ষেত্রে দণ্ড প্রয়োগে এসব পারিপার্শ্বিকতা কোনই প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। ইসলামী আইনে বিচারকের কোন অপরাধ ক্ষমা করার অধিকার থাকে না। তদ্রূপ কোন অপরাধীর শাস্তি বা দণ্ড মওকুফ করার ক্ষমতাও থাকে না। পক্ষান্তরে বর্তমান প্রচলিত আইনে সরকার প্রধান কিংবা রাষ্ট্র প্রধান অথবা সংসদ যে কোন অপরাধের শাস্তি রহিত করতে পারে।

ইসলামী আইনে 'হুদুদ'-এর ক্ষেত্রে আপস মীমাংসার অবকাশ যেমন নেই তদ্রূপ দায়মুক্তিরও কোন সুযোগ নেই। অবশ্য মিথ্যা অপবাদ আরোপের মতো 'হদ' প্রয়োগযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে আপস মীমাংসা কিংবা দায় মুক্তির[১] ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতভিন্নতা দেখা যায়। তবে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে 'হদ্দে কযফ' –মিথ্যা অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে আপস মীমাংসা কিংবা দায়মুক্তির সুযোগ নেই।[২]

কাসাসের ক্ষেত্রে কাসাসের হকদার যদি তার প্রাপ্য অধিকার ক্ষমা করে দেয় তাহলে কাসাস রহিত হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে বিচারক কাসাসের দণ্ড প্রয়োগ করতে পারেন না। অবশ্য অন্য শাস্তি প্রয়োগ করতে পারেন। এ দুটির মধ্যে পার্থক্যের কারণ হলো, 'কাসাস' বান্দার হক আর 'হদ' আল্লাহর হক-এর অন্তরভুক্ত।

দায়

উল্লেখিত অপরাধগুলোর জন্যে ইসলামী শরীয়ত কঠোর শাস্তির বিধান করলেও প্রত্যেকটি অপরাধ প্রমাণের জন্যে এমন কিছু শর্ত যুক্ত করেছে যে শর্তগুলো শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রকে করেছে খুবই সীমিত। যেমন, এসব অপরাধ প্রমাণের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছে। অন্যান্য অপরাধ প্রমাণের ক্ষেত্রে প্রমাণ পদ্ধতি এতোটা কঠোর করেনি। সেই সাথে এসব অপরাধে সামান্যতম সংশয় ও সন্দেহ হলেও তা অপরাধীর পক্ষে কল্যাণ বয়ে আনে। এসব অপরাধে শাস্তি প্রয়োগের মূলনীতিই হলো, কোন ধরনের অনিশ্চয়তা বা সংশয়ের অবকাশ থাকলে হদ বা কাসাস রহিত হয়ে যাবে।

শর্তের মধ্যে সামঞ্জস্য

'হুদুদ'-এর শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে শরীয়ত যেসব সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে তা হলো, চুরির হদ প্রয়োগ করতে হলে চোরাইকৃত জিনিসটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যমানের হতে হবে এবং চোর স্বাধীন ব্যক্তি হতে হবে, পরাধীন তথা দাসদাসী হলে হবে না। মিথ্যা অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে আরোপিত ব্যক্তির বিবাহিত হওয়াকে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। কোন কোন ফকীহর কাছে মাদকদ্রব্য সেবনের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার জন্যে মদ ছাড়া অন্যান্য মাদকের বেলায় নেশা সৃষ্টিকারী উপাদান থাকাকে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। এসব শর্ত যদি বিদ্যমান না থাকে তাহলে চুরির ক্ষেত্রে হাত কাটা এবং অপবাদ আরোপ ও মদ্যপানের ক্ষেত্রে 'দুররা' বা বেত্রাঘাত করার শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না। 'হদ' থেকে কিছুটা লঘু ধরনের শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। যেমন ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি ব্যভিচারী মুহসিন তথা বিবাহিত প্রমাণিত না হয়, যেভাবে এই অপরাধ প্রমাণকে শরীয়ত শর্তযুক্ত করেছে, তাহলে ব্যভিচারের অপরাধে তার ক্ষেত্রে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার হদ প্রয়োগ করা যাবে না। বরং কুমার তথা অবিবাহিতের মতো হদ প্রয়োগ করা হবে। অর্থাৎ একশ বেত্রাঘাত কিংবা সেই সাথে দেশান্তরের দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে। একশ বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রয়োগে ফকীহগণের ঐকমত্য রয়েছে কিন্তু একই সাথে দেশান্তর করার ক্ষেত্রে ফকীহদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে।

অপরাধের প্রমাণ

ব্যভিচারের অপরাধ প্রমাণের জন্য ইসলামী শরীয়ত চারজন প্রত্যক্ষ সাক্ষীর শর্তারোপ করেছে। প্রত্যক্ষদর্শী চারজন সাক্ষীর সাক্ষের ভিত্তিতেই ব্যভিচারের অপরাধ প্রমাণিত হবে। অবশ্য

অপরাধীর স্বীকৃতিও অপরাধ প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট। এক্ষেত্রে সাক্ষীর প্রয়োজন পড়ে না। এ ব্যাপারে কোন কোন ফকীহ বলেন, চার সাক্ষীর মতোই ভিন্ন ভিন্ন চারটি জায়গায় চারবার ব্যভিচারে অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ স্বীকার করতে হবে। শরীয়ত অপরাধ প্রমাণের জন্যে শর্তযুক্ত সাক্ষী এবং শর্তযুক্ত আত্মস্বীকৃতি এই দুই পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এক্ষেত্রে জমহুরের মতে একথাও বলা হয়েছে যে, এসব হুদুদ ও কাসাসের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের কোন সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় এবং শ্রুত তথা অন্যের কাছ থেকে শোনা এমন কারো সাক্ষও গ্রহণযোগ্য নয়।

সংশয় সন্দেহ

যে কোন ধরনের সন্দেহ ও সংশয়ের কারণে হদ-এর শাস্তি রহিত হয়ে যায়।[৩] মনে রাখতে হবে হদ-এর ব্যাপারে ইসলামী শরীয়ত সংশয় বা সন্দেহকে একটা মৌল ভিত্তির মর্যাদা দিয়েছে। তাই সন্দেহ ও সংশয়ের কারণে নির্দিষ্ট অপরাধীর নির্দিষ্ট শাস্তি রহিত হয়ে যায়।

সন্দেহের সংগা ও প্রকার

ফকীহগণ সংশয় সন্দেহ-এর সংগা সম্পর্কে বলেন, 'সন্দেহ বাস্তব ঘটনার সাথে সাদৃশ্য রাখে তবে আদতে তা বাস্তব হয় না। কেউ কেউ বলেন, সন্দেহ বা সংশয় হলো এমন একটা জিনিস দৃশ্যত যার মধ্যে বাস্তবতার উপাদান থাকে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাতে বাস্তবতা কিংবা বাস্তবতার প্রতিফলন থাকে না।

ইমাম আবু হানিফা র. সংশয় বা সন্দেহকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন, ১. সংশয়যুক্ত কর্ম, ২. সংশয়যুক্ত মালিকানা ৩. সংশয়যুক্ত চুক্তি।

সংশয়যুক্ত কর্ম : এটিকে সাদৃশ্যমূলক সংশয়যুক্ত কর্ম কিংবা অনুরূপ সংশয়যুক্ত কর্মও বলা হয়ে থাকে। সংশয় যুক্ত কর্মের অর্থ হলো, এমন কোন কাজে সন্দেহ হওয়া যাতে যে ব্যক্তির মধ্যে সংশয়যুক্ত হয়েছে তার জন্যে সেটি সংশয়যুক্ত আর যে ব্যক্তির মধ্যে কোন সংশয় দেখা দেয়নি তাতে তার কোন ধরনের সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই। এ ধরনের সংশয়ের ক্ষেত্রে অপরাধী বা অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজের কর্মের পক্ষে কোন শক্তিশালী কিংবা দুর্বল দলিলের ভিত্তি ছাড়াই কিংবা অন্য কারো কাছ থেকে কোন ধরনের অবহিত হওয়া ব্যতিরেকে নিজের উপলব্ধিতে কোন হারাম জিনিসকে হালাল ভেবে তা সম্পাদন করে ফেলে। যেমন, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দিয়েছে কিন্তু ইদ্দত চলাকালীন সময়ে সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলে, অথবা এমন স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে যে স্ত্রীর কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে সে তালাক দিয়ে দিয়েছে। সহবাস করার সময় সে মনে করেছে যে এই সময়ে সহবাস তার জন্যে হালাল, হারাম নয়। এ ধরনের সংশয়কে বলা হয় সংশয়যুক্ত কর্ম। এ ধরনের সংশয় কিংবা সন্দেহকে সংশয়যুক্ত কর্ম বলার কারণ

হচ্ছে এই যে, এখানে শুধু কর্মের মধ্যে সংশয়, কর্মের সম্পাদন স্থলে কোন ধরনের সংশয়ের অবকাশ নেই। কর্মের সংশয় যুক্ত হয়েছে কর্ম সম্পাদনকারীর শরয়ী বিধানের অজ্ঞতার কারণে। বস্তুত এ ধরনের সংশয় ও সন্দেহের কারণেও সংশয়যুক্ত কর্ম সম্পাদনকারীর ক্ষেত্রে হদ দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না।

ক্ষেত্রের সংশয় : যাকে হুকমী সংশয় বা অধিকারগত সংশয়ও বলা হয়। এ ধরনের সংশয় তখনই হয়ে থাকে, যদি এমন কোন কাজ করা হয় যেটির স্বপক্ষে বৈধ হওয়ার দলিল থাকে বটে কিন্তু পক্ষের দলিলের চেয়ে কাজটি অবৈধ হওয়ার দলিল হয় বেশি শক্তিশালী ও বিদ্যমান। বস্তুত তখন একাজ প্রকৃত পক্ষে অবৈধ তথা হারাম বলে সাব্যস্ত হবে। তবে যেহেতু এর বৈধতার পক্ষেও দলিল বিদ্যমান রয়েছে সেহেতু শরীয়তের দৃষ্টিতে একাজটি হারাম হওয়ার ব্যাপারটি সংশয়যুক্ত হয়ে যাবে। এ ধরনের সংশয়যুক্ত কাজগুলোর ক্ষেত্রে এ বিষয়টিই সাব্যস্ত হবে যে কাজটি বৈধ বা হালাল হওয়ার ব্যাপারে সম্পাদনকারীর সন্দেহ ছিল। যেমন মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীর অপরাধ তখনই সংশয়যুক্ত হয় যখন মিথ্যা আরোপকারী আরোপিত ব্যক্তির পিতা হয়। এ ক্ষেত্রে অপরাধ সাব্যস্ত হওয়ার সকল শর্ত বিদ্যমান থাকে। বস্তুত শর্ত বিদ্যমান থাকাটা হদ কার্যকরী হওয়ার তাকিদ দেয়। আমরা যদি প্রমাণাদির দিকে দৃষ্টি দেই যেসব প্রমাণাদিও শর্তাবলী দণ্ডকে অপরিহার্য ও সুনির্দিষ্ট করে দেয় তাহলে এমতাবস্থায় মিথ্যা অপবাদ আরোপকারী পিতার উপর দণ্ড প্রয়োগ হওয়াকেই সমর্থন করে তবে এক্ষেত্রে এমন একটি দলিলও বিদ্যমান রয়েছে যা পুত্রের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধে পিতার উপর দণ্ড প্রয়োগকে অবৈধ করে দেয়।

কুরআন কারীম পরিষ্কার ঘোষণা করেছে, 'পিতা-মাতাকে উহ শব্দ বলার মতো কষ্টও দিয়ো না'। এ আয়াত দাবী করে পিতা-মাতার অপরাধে দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না। অনুরূপভাবে 'পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো' নির্দেশ দেয়া হয়েছে পবিত্র কুরআনে। মিথ্যা অপবাদ আরোপের অপরাধে পিতার উপর কযফের দণ্ড প্রয়োগ সদ্ব্যবহারের পরিপন্থী। পিতা-মাতার কযফের অপরাধের ক্ষেত্রে যে হুকুম চুরির অপরাধের ক্ষেত্রেও একই হুকুম। সেখানেও পুত্রের সম্পদে পিতার চুরি হারাম হওয়ার বিপরীতে একটি মজবুত দলিল রয়েছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে হাত কাটার বদলে লঘু দণ্ডের অবকাশও আছে। সেখানে দলিল হলো 'তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার সম্পদ'। এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় পুত্রের সম্পদে পিতার এক ধরনের মালিকানা ও অধিকার রয়েছে। সাধারণত পুত্রের সম্পদে পিতা হস্তক্ষেপ করতে পারে কেননা উভয়ের মধ্যে সীমাহীন মিল হওয়ার অবকাশ রয়েছে। একই বিধান স্বেচ্ছায় হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যে ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীর ছেলে হয়। এ ধরনের সংশয়ের অবকাশ থাকার কারণে চুরি ও কযফের ক্ষেত্রে পিতার উপর হদ প্রয়োগ করা যাবে না, তার হাত কাটা যাবে না, তার কাছ থেকে কাসাস নেয়া যাবে না।

সন্দেহযুক্ত বিবাহ

ইমাম আবু হানিফা র. ও ইমাম যুফার র.-এর দৃষ্টিতে বাহ্যিক বিবাহের উপকরণ বিবাহের সাথে সম্পৃক্ততা সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ট। এ ধরনের বিবাহের পর যদি নারী-পুরুষের মধ্যে মিলন ঘটে তাহলে সেই মিলনটি সংশয়যুক্ত মনে করা হবে। যেহেতু এধরনের আক্‌দকারী পক্ষদ্বয়ের ইজাব ও কবুল সম্পাদিত হয়েছে। বস্তুত পাত্র পাত্রীর মধ্যে ইজাব কবুল সম্পাদনের যোগ্যতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

এ ধরনের বিবাহে যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলন ঘটে তবে তাতে সংশয়ের ভিত্তি থাকবে কিন্তু যিনার শাস্তি তথা হদ রহিত হয়ে যাবে। উদাহরণত কোন ব্যক্তি যদি মুহরিমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তার সাথে সহবাসও করে ফেলে এমতাবস্থায় সর্ব সম্মতিক্রমে বিবাহচুক্তি বাতিল বা হারাম সাব্যস্ত হলেও আক্‌দ (বিবাহচুক্তি)-এর কারণে এর মধ্যে যে সংশয় সৃষ্টি হয় এর ভিত্তিতে যিনার শাস্তি হদ প্রয়োগ করা যাবে না। যদিও এ ক্ষেত্রে মুহরিমার সাথে বিয়ে বন্ধনের বিষয়টি হারাম হওয়া ব্যভিচারী জ্ঞাত ছিল।

ইমাম আবু ইউসুফ র. ও ইমাম মুহাম্মদ র. এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা র.-এর বিপরীত মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেন, অপরাধীর যদি বিবাহ হারাম হওয়ার জ্ঞান না থাকে তাহলে হদ রহিত হবে। কেননা এ ব্যাপারে ক্ষেত্রের সংশয় বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু মুহরিমার সাথে বিবাহ হারাম অপরাধীর যদি এ জ্ঞান থাকে তাহলে শাস্তি (হদ) রহিত হবে না। ইমামদ্বয়ের কাছে সে ক্ষেত্রে শুধু বাহ্যিক বিবাহের আক্‌দ সংশয় সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ট নয়।

সংশয়ের আরেকটি প্রকার অপরাধ প্রমাণের সাথে সম্পৃক্ত। অপরাধ প্রমাণের ক্ষেত্রে যদি কোন ধরনের সংশয় সৃষ্টি হয় সে ক্ষেত্রে অপরাধীর শাস্তি হদ রহিত হয়ে যাবে। যেমন ব্যভিচার, চোরাইপণ্য বা মদপানের অপরাধের ক্ষেত্রে এতো বিলম্বে সাক্ষী উপস্থাপন করা হয়েছে যে, বিচারকের কাছে এ বিলম্বের কোন যৌক্তিকতা নেই। এমতাবস্থায় সাক্ষীর ব্যাপারেই সংশয় জন্ম নেয়, আর সংশয় যুক্ত সাক্ষে হদ প্রয়োগ করা যায় না। যেমন স্বীকারোক্তি তাৎক্ষণিক করা হয়েছে বটে কিন্তু এর বর্ণনা রেকর্ড করা হয়েছে বেশি বিলম্বে। অপরাধী যদি বোবা হয়, সে যদি লিখিত আকারে কিংবা পরিষ্কার ইশারায় স্বীকারোক্তি দিয়ে থাকে কোন কোন ফকীহ'র দৃষ্টিতে তাতে সংশয়যুক্ত হওয়ার কারণে হদ রহিত হয়ে যাবে।[৪]

সংশয়ের আইনগত পরিণতি

সংশয়ের ভিত্তিতে যদি অপরাধীর উপর আরোপিত শাস্তি রহিত করে দেয়া হয় তাহলে ব্যাপারটি দুটির একটি পরিণতি লাভ করবে।

এক. অপরাধীর উপর আরোপিত শাস্তি রহিত হওয়ার সাথে সাথে সে অভিযুক্ত অপরাধ থেকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ গণ্য হবে। কেননা তার অপরাধী হওয়ার ব্যাপারটিই সংশয়পূর্ণ। তাই তাকে একই অভিযোগে অন্য কোন ধরনের শাস্তিও দেয়া যাবে না।

দুই. হদ প্রয়োগযোগ্য অপরাধে নির্দিষ্ট শাস্তির পরিবর্তে তাকে অন্যকোন শাস্তি দেয়া হবে। এটি এমন পরিস্থিতিতে করা হবে যখন তার ব্যাপারে সৃষ্টি হওয়া সংশয়টি তেমন শক্তিশালী নয় যে তাকে অপরাধীর বদলে সম্পূর্ণ নিরপরাধ বলে সাব্যস্ত করবে। এক্ষেত্রে বিচাকের অধিকার আছে বরং বিচারকের কর্তব্য হলো, হদ প্রয়োগের পরিবর্তে তার উপর অন্যকোন একটি বা একাধিক শাস্তি প্রয়োগ করা। বিচারক তাকে নিরপরাধ ঘোষণা করতে পারবেন না। এ ধরনের শাস্তিগুলোকে ইসলামী আইন তথা শরীয়তের ভাষায় তা'যিরাত অর্থাৎ ভীতিসঞ্চারমূলক এবং শিক্ষণীয় কিছু শাস্তি বলা হয়।

যে সব সংশয় সন্দেহের ভিত্তিতে অপরাধীর উপর থেকে নির্দিষ্ট শাস্তি রহিত করে দেয়া হয় এবং অপরাধীকে নিরপরাধ ঘোষণা করা হয় সেসব শক্তিশালী সংশয় সন্দেহকে দুভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ

এক. সংশয় সন্দেহটা অপরাধের মূলভিত্তি তথা আরকানের মধ্য থেকে মৌলিক কোন আরকানে সন্দেহ সংশয় পাওয়া যাবে।

দুই. যে কর্মের অপরাধে অভিযুক্তকে অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে সেই কর্মের ব্যাপারেই সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে এই কর্মের ব্যাপারে যে দলিল প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয় তার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে বা নাও থাকতে পারে।

অপরাধের মৌলভিত্তিগুলোর মধ্যে যদি সংশয় জন্ম নেয় তাহলে যেহেতু অপরাধটি সন্দেহজনক হয়ে ওঠে তাই অপরাধীকে অপরাধ থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হবে এবং তাকে আর কোন শাস্তিই দেয়া যাবে না। মূল অপরাধের ব্যাপারেই যদি সংশয় সৃষ্টি হয়, এর উদাহরণ হলো, কেউ যদি এমন কোন নারীর সংস্পর্শে যায় যে নারীকে বিয়ের দিনই তার কাছে নিয়ে আসা হয়েছে এবং লোকজন যদি তাকে জানায় এই নারীর সাথেই তোমার বিবাহ হয়েছে, তাহলে এই পুরুষের ক্ষেত্রে যিনার ইচ্ছার ব্যাপারটি প্রমাণিত হবে না। কারণ সে যিনার উদ্দেশ্যে এ নারীর সংস্পর্শে যায়নি বরং সে তার বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গ লাভের জন্যেই গিয়েছিল। আর সেটি ছিল তার কাছে সম্পূর্ণ বৈধ। যদি পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় যে, সে তার বাগদত্তা স্ত্রীর কাছে যায়নি। অন্যকোন নারীর সাথে মিলিত হয়েছে তাতেও সে অপরাধ কর্ম করেছে বলে প্রমাণিত হবে না।

ইমাম আবু হানিফা র. মনে করেন, ভোঁতা এবং ধারালো নয় এমন কোন জিনিস দিয়ে কাউকে হত্যা করা হলে তা মৌল জরিমানামূলক কাজের মধ্যেই সংশয় পর্যায়ভুক্ত হবে। কারণ এ ক্ষেত্রে বিষয়টি সংশয়যুক্ত হয়ে পড়ে যে অভিযুক্তের হয়তো হত্যা করার ইচ্ছাই ছিলো না। হত্যার সংকল্পের মধ্যে সংশয় দেখা দেয়ায় অপরাধীর উপর থেকে কাসাস রহিত হয়ে যাবে, এবং অপরাধীকে স্বেচ্ছায় হত্যাকারীর পরিবর্তে সংশয়যুক্ত সংকল্পের অপরাধে অভিযুক্ত করা হবে।[৫]

যে নস বা প্রামাণ্য দলিল অভিযুক্তের কাজটিকে হারাম সাব্যস্ত করে সেই নস-এর ইবারতে কাজটি সরাসরি উল্লেখ আছে কি নেই যদি এ ব্যাপারে সংশয় থাকে, ফকীহদের মধ্যে যদি এক্ষেত্রে মতভেদ দেখা যায়, যদি কোন কোন ফকীহ বলেন, এই ইবারতের মধ্যে এ কাজটির অস্তিত্ব রয়েছে

আবার কোন কোন ফকীহ্ বলেন, এই ইবারতের সাথে উল্লেখিত কাজটির কোন অস্তিত্ব নেই। যেহেতু কোন কোন ফকীহর কাছে সম্পাদিত কাজটি অপরাধ হিসেবে গণ্য নয়, তাই অভিযুক্তের পক্ষে উপকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অভিযুক্তকে নিরপরাধ হিসেবে মুক্তি দেয়া হবে। ব্যভিচারের ক্ষেত্রে এ প্রসঙ্গটির উদাহরণ দেখা যায়। যেমন কোন পুরুষ যদি সাক্ষী ছাড়া বিবাহ কর্ম সম্পাদন করে, অথবা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কোন তরুণী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং উক্ত পুরুষ সেই স্ত্রীর সাথে সহবাস করে এক্ষেত্রে ফকীহদের মধ্যে মতভিন্নতা দেখা যায়। কেউ কেউ এই সহবাসকে বৈধ বলেছেন, আবার কেউ কেউ এটিকে অবৈধ হারাম সাব্যস্ত করেছেন। এই মতভিন্নতার কারণে সহবাস হারাম করার নস-এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি সংশয়পূর্ণ হওয়ার কারণে অভিযুক্তের উপর ব্যভিচারের হদ প্রয়োগ করা যাবে না।

অনেক সময় অপরাধ প্রমাণের ক্ষেত্রেও সংশয় দেখা দেয়। অপরাধের অস্তিত্ব সম্পর্কেই যদি সংশয় দেখা দেয় যে অপরাধে শরীয়তে সুনির্দিষ্ট শাস্তি রয়েছে, সে ক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দিষ্ট শাস্তি র বিধানটি অকার্যকর হয়ে যায়। তখন হয় অভিযুক্তকে সম্পূর্ণ নির্দোষ অভিহিত করে মুক্ত করে দিতে হবে নয়তো অন্য কোন লঘু শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে। যে শাস্তিকে তা'যির বলা হয়।

অপরাধের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে যেসব সংশয়ের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পূর্ণ খালাস পেতে পারে এর উদাহরণ হলো, যেমন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে চুরি, মদপান অথবা ডাকাতির অভিযোগ উত্থাপন করা হল, এখানে অপরাধ প্রমাণের একমাত্র ভিত্তি রাখা হয়েছে সাক্ষী। দু'জন সাক্ষীর সাক্ষে অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু বিচারক রায় ঘোষণার আগেই সাক্ষীরা তাদের দেয়া সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়। এক্ষেত্রে এই সংশয়টিই জোরালো হয়ে ওঠে সাক্ষী এখন যে কথাটি বলছে হয়তো এটিই সঠিক। এমন সংশয় জন্ম নেয়ার পর একই সাক্ষীর পূর্ব কথার উপর মোটেও নির্ভর করা যায় না। বস্তুত এক্ষেত্রে অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ার কারণে অভিযুক্তের উপর থেকে শুধু হদই রহিত হবে না, তখন বিচারকের জন্য আবশ্যিক হয়ে পড়বে অভিযুক্তকে নিরপরাধ ঘোষণা করা। কেননা সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হয়নি এবং এক্ষেত্রে সাক্ষী ছাড়া অপরাধ প্রমাণের আর কোন দলিল নেই।

যেসব অবস্থায় অপরাধ প্রমাণে সংশয় দেখা দেয়ায় অভিযুক্তের উপর থেকে হদ রহিত হয়ে যায় বটে কিন্তু তাকে নিরপরাধ অভিহিত করা যায় না এর উদাহরণ হলো, কোন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণের ভিত্তি যদি অপরাধীর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে হয়, আর বিচারক শাস্তি ঘোষণার আগেই যদি সে তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে তাহলে সেই অপরাধীর উপর হদ প্রয়োগ করা যাবে না। কারণ স্বীকারোক্তি অস্বীকার করায় কিংবা প্রত্যাহার করায় তার কৃত অপরাধের ক্ষেত্রে সংশয়ের অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে। তবে এই স্বীকারোক্তি ও প্রত্যাহারের ঘটনায় তাকে অন্য কোন শাস্তি দেয়া যেতে পারে, যেসব শাস্তি তাযিরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

উপরের আলোচনায় অপরাধীর অপরাধের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করা আর সাক্ষীর সাক্ষ প্রত্যাহার

করা একই দৃষ্টিতে দেখা যাবে না। সাক্ষীদের সাক্ষ প্রত্যাহারের কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তি বেকসুর নিরপরাধ সাব্যস্ত হবে। কিন্তু অপরাধীর অপরাধের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার তাকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করবে না, কারণ সাধারণত মানুষ হদ প্রয়োগযোগ্য এমন অপরাধে অপরাধী বলে স্বীকারোক্তি করে না। কিন্তু সাক্ষীদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। অনেক মানুষ রাগ বা অনুরাগে, প্রলোভনে বা চাপে পড়ে মিথ্যা সাক্ষী দেয়? পক্ষান্তরে কোন অপরাধ না করে সাধারণত মানুষ অপরাধ করার কথা স্বীকার করে না। এক্ষেত্রে অপরাধী যদি বিচারকের অগোচরে অন্য কোন লোকের কাছে স্বীকারোক্তি দেয় তাহলে এই স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তাযিরাতের অন্তরভুক্ত যে কোন শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে কিন্তু হদ প্রয়োগ করা যাবে না।

বিচারক যদি মনে করেন, অপরাধী অপরাধ সংগঠনের যে আত্মস্বীকৃতি দিয়েছে তা সঠিক তাহলে বিচারক তাকে নিরপরাধ ঘোষণা করতে পারেন। কিন্তু যদি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অপরাধী যে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করেছে, জবরদস্তিমূলকভাবে তার কাছ থেকে এ ধরনের স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছিল, তাহলে সেই স্বীকারোক্তির গ্রহণযোগ্যতার শরয়ী ভিত্তি নেই। বস্তুত এজন্য এই অপরাধে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। উপরের আলোচিত স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে যে বিধান কার্যকর এ ধরনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও একই বিধান কার্যকর থাকবে। অপরাধ প্রমাণ ও হদ প্রয়োগের পক্ষে যদি অতি আবশ্যিক প্রমাণাদি না থাকে, অথবা দলিল প্রমাণ আছে বটে কিন্তু হদ ও কাসাসের দণ্ড প্রয়োগের জন্য অপরাধ প্রমাণের পক্ষে যে ধরনের শক্তিশালী প্রমাণাদি দরকার– প্রমাণাদি যদি তেমন শক্তিশালী না হয় তবে হদ ও কাসাসের নির্দিষ্ট শাস্তি রহিত হয়ে যাবে তবে বিচারক যদি বুঝতে পারেন যে প্রমাণাদি দিয়ে সাব্যস্ত না হলেও অভিযুক্ত ব্যক্তি ঠিকই অপরাধী তাহলে তিনি তার বিবেচনা অনুযায়ী কোন শাস্তি দিতে পারেন। এ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে দণ্ডাদেশ জারি করার অধিকার বিচারকের বিবেচনার উপর নির্ভর করবে।

উপরে উল্লেখিত অবস্থাগুলো ছাড়াও অন্যান্য কারণেও সংশয়ের কারণে হদ রহিত হয়ে যাওয়াটা অপরাধীকে সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণ করে না। হদ রহিত হয়ে গেলেও বিচারকের বোধ বিবেচনায় যদি মনে হয় অপরাধী নির্দোষ নয় তাহলে তাযিরাতের পর্যায়ভুক্ত যে কোন ধরনের শাস্তির ঘোষণা বিচারক করতে পারেন।

হদ ও কাসাসের ক্ষেত্রে সংশয় কার্যকর ভূমিকা পালন করে এবং অপরাধীর শাস্তি প্রতিরোধ করে কিন্তু অপরাধীকে হদ ও কাসাসের আওতা বহির্ভূত অন্যান্য লঘু শাস্তি দিতে বারণ করে না। যতোক্ষণ না সংশয়টি মূল কাজটির ব্যাপারেই সন্দেহকে ঘণিভূত করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়– কেউ যদি এমন কোন নারীকে বিবাহ করে বসে যে নারীর সঙ্গে তার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন সব সময়ের জন্যেই সম্পূর্ণ হারাম এবং তার সাথে সহবাসও করে ফেলে তবে এই বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হওয়ার ব্যাপারে তার জ্ঞান থাকুক বা নাই থাকুক তবুও তার উপর শাস্তি বর্তাবে। ইমাম আবু হানিফা র. বলেন, এক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির যদি সেই নারীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন

হারাম হওয়ার জ্ঞান থাকে তবে শাস্তিযোগ্য হবে। অথবা কোন ব্যক্তি যদি সামান্য কোন জিনিস চুরি করে অথবা এমন কোন জিনিস চুরি করে যা করাটা অপরাধের পর্যায়ভুক্ত নয়। যেমন বন্য শিকার। মূলত বনের শিকার যে কারো জন্যে হালাল কিন্তু যখন বনের কোন পশু পাখি কেউ শিকার করে তখন সেটি তার মালিকানাধীন হয়ে যায়। এ ব্যাপারে কোন কোন ফকীহর সংশয় থাকার কারণে শিকার চুরির অপরাধে হদ এর শাস্তি দেয়া হবে না তবে তা'যির অবশ্যই দেয়া হবে। বস্তুত যেসব কারণে এই চুরির হদ থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে সেসব দলিল বিদ্যমান থাকার পরও এ ধরনের সম্পদ চুরি নিসন্দেহে হারাম। ফলে হারাম কাজের অপরাধী তাযিরী শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে পারে না।

সংশয়ের ভিত্তিতে হদ রহিত হয়ে যাওয়ার যেসব শর্ত ও মূলভিত্তি ইসলামী শরীয়ত নির্ধারণ করেছে, বর্তমান যুগের সকল আইন সেগুলোকে আত্মস্থ করেছে। অবশ্য আধুনিক আইনজ্ঞরা ইসলামী ফকীহদের অনেক বিশ্লেষণকে গ্রহণ করেননি। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, অপরাধীকে সংশয় থেকে সৃষ্ট যে সকল সুবিধা পাশ্চাত্য আইনে দেয়া হয়েছে এর সবগুলোই ইসলামী আইন বিশারদদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকেই ধার করা। বিশেষ করে ফকীহদের মূলনীতি যে কোন হদ-যোগ্য অপরাধে সংশয় হদ প্রয়োগ রহিত করে দেবে'-এর প্রয়োগ অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত।

অসংখ্য অবস্থার মধ্যে একটি অবস্থা এমন যে, বিচারক যদি এমন সংশয় পান যা অপরাধ আরো কঠিন করে তোলে যেমন, চুরির অভিযোগের ক্ষেত্রে বিচারক যদি জানতে পারেন প্রকৃত পক্ষে এটি শক্তি প্রয়োগের চুরি নয়, তাহলে বিচারক অপরাধীকে শক্তি প্রয়োগে চুরির অভিযোগ থেকে রেহাই দিতে পারেন। কিন্তু শক্তি প্রয়োগ না করলেও মূলত চুরি কর্মটি যদি প্রমাণিত হয় তাহলে সাধারণ চুরির শাস্তি অবশ্যই দিতে হবে।

অনুরূপ ইচ্ছাকৃত হত্যার অভিযোগের ক্ষেত্রে যদি প্রমাণিত হয় অভিযুক্ত ব্যক্তি আগে থেকে নিহতের পিছু লেগেছিল এবং সুযোগের অপেক্ষা করছিল, তাহলে হত্যাকাণ্ডটির প্রমাণ সংশয়যুক্ত হলেও ইচ্ছাকৃত হত্যার বিষয়টি সংশয়যুক্ত হবে না বরং এক্ষেত্রে এ বিষয়টিও সাব্যস্ত হবে যে, হত্যাকারী ইচ্ছাকৃতভাবেই নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। যদি সন্দেহ এমন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যা মূলত অভিযোগকে সংশয়যুক্ত করে ফেলে যেমন হত্যাকাণ্ড ঘটানোর শুরুতে হত্যার ইচ্ছা ছিল কি-না, সেক্ষেত্রে বিচারক নিজ বিবেচনায় সিদ্ধান্ত দিবেন অপরাধী ইচ্ছাকৃত প্রহারে অভিযুক্ত কিংবা ভুলবশত আঘাতকারীর অপরাধে অপরাধী।

কোন কোন সময় বিচারক অপরাধের মূল ভিত্তিগুলোতেই সংশয়ে পড়েন, যে সবের ভিত্তিতে অপরাধ প্রমাণিত হয় সেসব ক্ষেত্রে বিচারক অপরাধীকে বেকসুর নিরপরাধ অভিহিত করতে পারেন। যেমন– চুরির অপরাধের ক্ষেত্রে বিচারকের দৃষ্টিতে যদি দুর্নীতির সংশ্রব আছে বলে মনে হয়, সংশয়যুক্ত ক্ষেত্রের ভিত্তিতে বিচারক অপরাধীকে নিরপরাধ ঘোষণা করতে পারেন।

তা'যির বা শাস্তি

ইতোপূর্বে আমরা সেই সব অপরাধ কর্ম নিয়ে আলোচনা করেছি যেসব অপরাধের শাস্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট কয়েকটি অপরাধের ক্ষেত্রেই শাস্তি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এগুলো ছাড়া আর যেসব অপরাধে শাস্তি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি সেসব অপরাধে হদ ও কাসাসের চেয়ে লঘু যে কোন ধরনের শাস্তি দেয়া যেতে পারে। শরীয়তের পক্ষ থেকে যেসব অপরাধের শাস্তি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি সেগুলোকে তাযির নামে অভিহিত করা হয়।

তাযির আরবী উযর শব্দ থেকে উদ্ধৃত। আভিধানিক অর্থে তাযির শব্দের অর্থহলো বাধা দেয়া নিষেধ করা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা বা রুখে দেয়া। আরবীতে বলা হয় 'আযযারা ফুলানুন আখাহু' সে তার ভাইকে সাহায্য করেছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে– তুয়াযযিরুহু ওয়াতুআ ককিরুহু' রসূল স.-এর সাথে সহযোগিতা করো এবং তাঁকে মহান মনে করো? (সূরা ফাতাহ আয়াত : ৯) এছাড়া আরো বলা হয় 'আযযারতুহু' আমি তাকে সম্মান করেছি। এ বাক্যটি আমি তাকে শিষ্টাচার শিখিয়েছি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাযির শব্দটি বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয় এমন বিশেষ্য পদের পর্যায়ভুক্ত। তাযির সম্মান অর্থে তখনই ব্যবহৃত হয় যখন কোন ব্যক্তি শাস্তি ভোগের কারণে অপরাধ কর্ম থেকে বিরত থাকে তখন সে নিজেকে সম্মানিত করে সমাজে মর্যাদাবান হয়ে যায়। এ ধরনের শাস্তিকে এ অর্থেও তা'যির বলা হয় যে, শাস্তি অপরাধীকে অপরাধ কর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখে। অথবা কোন একবার অপরাধ করে শাস্তি ভোগের পর আর দ্বিতীয়বার একই অপরাধ করার সাহস করে না।

ফকীহদের দৃষ্টিতে তা'যিরের সংগা হলো, তা এমন এক অনির্দিষ্ট শাস্তি যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অপরাধী মানুষের উপর আবশ্যিকভাবে আপতিত হয় কিন্তু তা হদ ও কাসাসের মতো সুনির্দিষ্ট নয়। শিষ্টাচারের প্রতি আগ্রহী করে তোলা, মানুষকে সংশোধন করা এবং অপরাধ থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে তা'যির হদ ও কাসাসের সাথে সামঞ্জস্য রাখে।[৬]

সুনির্দিষ্ট শাস্তির সাথে তা'যিরও কি যুক্ত হতে পারে? ফকীহগণ তাযির বলতে এমন শাস্তিকে বোঝান যেসব অপরাধে শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত হদ বা কাফফারা নেই সেসব অপরাধে শাস্তি স্বরূপ তাযির কার্যকর হয়। এ সংগার দ্বারা বলা যায় যে, হদ কাসাস ও কাফফারা আল্লাহর তাআলার পক্ষ থেকে কয়েকটি বিশেষ অপরাধে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কোন একটি অপরাধে যদি কোন ধরনের শাস্তি নির্দিষ্ট থাকে তাতে এটাই সাব্যস্ত হয় যে এর পর আর কোন অনির্দিষ্ট শাস্তি এতে যোগ করার কোন দরকার নেই। কিন্তু তারপরও অনেকের মনে এই খটকা থেকেই যায় শরীয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট হদ, কাসাস ও কাফফারার পর একই ব্যক্তির উপর তাযির প্রয়োগ কি জায়েয না নাজায়েয?

হদ ও কাসাসের সাথে তা'যির

পূর্ববর্তী ফকীহদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এমন অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় যাতে হদ ও কাসাসের সাথে সাথে তাযিরও প্রয়োগ করা যায়। হানাফী মতাবলম্বীদের একথা আমরা আগেও উল্লেখ করেছি। হানাফী মতাবলম্বীগণ অবিবাহিত ব্যভিচারীকে শাস্তিস্বরূপ দেশান্ত র করাকে হদ-এর অংশ বলে বিবেচিত নয় বলে মনে করেন। তাদের দৃষ্টিতে শুধু একশ বেত্রাঘাতই হদ যে সম্পর্কে কুরআন কারীমে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু দেশান্তরকে হদ-এর অন্তর্ভুক্ত মনে না করলেও তাঁরা এ ধরনের অপরাধীদেরকে বেত্রাঘাতের পাশাপাশি দেশান্তরকেও জায়েয মনে করেন। বস্তুত হানাফীদের দৃষ্টিতেও অবিবাহিত ব্যভিচারীকে শাস্তি স্বরূপ শত বেত্রাঘাতের পর দ্বীপান্তর করা যাবে। তাদের মত হলো, তাযির হিসেবে দ্বীপান্তরের শাস্তিও বলবৎ করা যাবে যদি তাতে কোন উপকারিতা থাকে।

মুঈনুল হুক্কাম গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রসূল স. মদপানকারীকে কোরা (চাবুক) লাগানোর পর সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিয়েছেন, 'একে তোমরা শাস্তি দাও এবং ধিক্কার জানাও।' রসূল স.-এর নির্দেশে সাহাবায়ে কেরাম মদপানকারীকে বলতে লাগলেন, ও হে তোমার কি আল্লাহর কোন ভয় নেই, তোমার কি লজ্জা শরম নেই? এতে পরিষ্কার বোঝা যায় এসব লাঞ্ছনা ছিলো হদ-এর অতিরিক্ত আর এই অতিরিক্তটা তাযির ছাড়া আর কি হতে পারে! বস্তুত এই বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়, হদ ও তাযির একই সাথে প্রয়োগ করা যায়।[৭]

তাবসারাতুল হুককাম গ্রন্থে মালেকী মাযহাবের একটি মতামত উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে আহত করে তাহলে তার কাছ থেকে কাসাস নেয়া হবে। সেই সাথে তাকে সংশোধনমূলক শাস্তিও দেয়া হবে। এ কথা থেকে বোঝা যায় মালেকী মাযহাবের অনুসারীরাও হত্যাকাণ্ডের চেয়ে কম পর্যায়ের ক্ষতি সাধনের ক্ষেত্রে কাসাসের সাথে সাথে তাযিরও যুক্ত করাকে বৈধ মনে করেন। তারা বলেন, কাসাস হলো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষয়ক্ষতির ভর্তুকি কিন্তু তাযির হলো অপরাধীর আত্মসংশোধনমূলক শাস্তি যা সামাজিকভাবে প্রত্যাশিত।

অবশ্য মালেকীদের এই যৌক্তিকতার প্রয়োগ তখন প্রযোজ্য হবে না, যখন ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ কাউকে হত্যা করে। কারণ তখন তার অবধারিত শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আর মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগের পর আর কোন শাস্তি দানের অবকাশ থাকে না। হ্যা, অবশ্য তখন তাযির বৈধ হয়ে যায় যখন কোন কারণে কাসাস নেয়া সম্ভব না হয় যাতে অপরাধী শাস্তি থেকে সম্পূর্ণ রেহাই না পেয়ে যায়।

হানাফী মতাবলম্বীদের কাছেও মালেকীদের মতো মদ্যপানকারীর উপর হদ জারী করার পর মৌখিক তাযির প্রয়োগ করা যায়। তাদেরও প্রামাণ্য দলিল হলো সেই আবু হুরায়রা রা-এর হাদীস যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে।[৮]

ইমাম আহমদ র.-এর দৃষ্টিতে চোরের হাত কাটার পর তার কাটা হাতটি গলায় ঝুলিয়ে দেয়া উচিত। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের অনুসারীরা এ ক্ষেত্রে ফাদালা বিন উবায়েদ-এর বর্ণনা থেকে

প্রমাণ পেশ করেন। এ বর্ণনায় বলা হয়েছে, নবী করীম স.-এর সামনে এক চোরকে হাজির করা হলে, তার হাত কেটে দেয়া হলো। অত:পর নির্দেশ দেয়া হলো, তার কাটা হাত তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হোক। হযরত আলী র. তাঁর শাসনামলে এ বর্ণনার নির্দেশ কার্যকর করেছেন। এক্ষেত্রে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে এ কাজের মধ্যে চুরি সম্পর্কে মারাত্মক ঘৃণা, ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করা যায়। এটাকে এ দৃষ্টিতে তাযির বলা যায়। কারণ চুরির অপরাধে সুনির্দিষ্ট শাস্তি প্রয়োগের পর এটি অতিরিক্ত আরেকটি সাজা বা তাযির।[৯]

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, ইসলামী শরীয়তে তাযির সাধারণত এ ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয় যেসব অপরাধের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত কোন বিশেষ শাস্তি নির্দিষ্ট করে দেয়নি। এটিই এ আইনের মূলভিত্তি। তবে ইসলামী আইনে এমন কোন বিধান নেই যা হদ ও কাসাসের সাথে তাযির যুক্ত হওয়াকে রোধ করে। বস্তুত এসব ক্ষেত্রে হদ ও কাসাসের শাস্তি প্রয়োগের সাথে তাযির প্রয়োগ কল্যাণকর বিবেচিত হয়। কেননা তাযির প্রয়োগ করা হয় সামাজিক কল্যাণ ও ব্যক্তির আত্মসংশোধনের জন্য।

অবশ্য এ বিষয়টির প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখতে হবে যে, যেসব শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের পর্যায়ভুক্ত যেমন স্বেচ্ছায় হত্যা করার কাসাস এসব ক্ষেত্রে তাযির প্রয়োগের বিষয়টি ভেবে চিন্তে করতে হবে। কেননা মৃত্যুদণ্ড যেহেতু অপরাধীর জীবনাবসান ঘটাবে সে ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগের আগে তার উপর তাযিরী শাস্তি প্রয়োগ মৃত্যুদণ্ডকে আরো ভয়ানক করে তুলবে। বস্তুত এক্ষেত্রে আইনদাতা আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে তাযির প্রয়োগের কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-বাদায়ে ওয়াস সানায়ে; আল-কাসানী খণ্ড-৭ পৃষ্ঠা ৫৫ প্রথম সংস্করণ মাত্‌বায়াতুল জামালিয়া, মিসর ১৯১০ খৃ:।

২. আল-বাদায়ে লিল-কাসানী ৭ম খণ্ড ৫৬ পৃষ্ঠা।

৩. এ হাদীসটি সংশয় সন্দেহ দ্বারা হদ ও কাসাস রহিত হয়ে যাওয়ার ভিত্তি। হাদীসে বলা হয়েছে 'সংশয় সন্দেহ দেখা দিলে হদ প্রয়োগ রহিত করে দাও'। অপরাধীর পক্ষে যদি শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপাদান পেয়ে যাও, তাহলে তাকে মুক্ত করে দাও। কারণ বিচারক যদি তাকে ক্ষমা করার ক্ষেত্রে কোন ধরনের ভুল করে বসেন এর চেয়ে বরং এটিই শ্রেয় যে তাকে শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রেও ভুল করতে পারেন। জাহেরিয়া সম্প্রদায় এ হাদীসকে সহীহ মনে করে না। এজন্য তারা সন্দেহের ভিত্তিতে হদ রহিত হয়ে যাওয়ার বিপক্ষে। (এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন 'মুহাল্লা ইবনে হযম খণ্ড-১১ পৃষ্ঠা ১৫৩ দারুত তাবায়াতুল মুনীরিয়া-১৩৫২ হিজরী)

এই প্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট শাস্তিগুলোর বর্ণনার পাশাপাশি সংশয় ও সন্দেহের আলোচনাকে আমি এজন্য সংযুক্ত করেছি যে যদিও সংশয় সন্দেহের কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধী বেকসুর খালাস পেয়ে যায় কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরাধীকে সুনির্দিষ্ট শাস্তির পরিবর্তে সংশয়ের কারণে অনির্ধারিত শাস্তি তাযির দেয়া হয়। -গ্রন্থকার।

৪. আল মবসূত-আস্‌সরাখসী খণ্ড-৯ পৃষ্ঠা-১৫১ মাতবায়া আসসায়াদাত, মিসর। আলবাদায়ে লিলকাসানী খণ্ড-৭ পৃষ্ঠা-১৪৬ ও পৃষ্ঠা ২৩৫ তাবায়া আল জামালিয়া, মিসর-১৩২৮ হিজরী। ১৯১০ খৃ. আল আহওয়ালুশ শখসিয়া কিসমুয যাওয়াজ, মুহাম্মদ আবু যাহরা পৃষ্ঠা-১৪৪ আততাশরীঈল জিনাঈল ইসলামী, আবদুল কাদের আওদা খণ্ড-১ কিসমুল আম পৃষ্ঠা-২০৭।

৫. বাদায়ে লিল কাসানী খণ্ড-৭ পৃষ্ঠা-২৩৩-আলমাবসুত লিসসরাখসী-খণ্ড-২৬ পৃষ্ঠা-১২২ শরহে আয যাইলাঈ আলা মতনিল কানয খণ্ড-৬ পৃষ্ঠা-৯৭।

৬. আসসরাখসী খণ্ড-৯ পৃষ্ঠা-৩৬ ফাতহুল কাদির খণ্ড-৭ পৃষ্ঠা-১১৯ শরহে কানয লিয-যাইলাঈ খণ্ড-৩ পৃষ্ঠা-২০৭ সুবুলুসসালাম শরহে বুলুগুল মারাম খণ্ড-৪ পৃষ্ঠা-৪৯। কাশশাফ আলকিনা আল মাতানিল ইকনা খণ্ড-৪ পৃষ্ঠা-৭২ আল-আহকামুস সুলতানিয়া আল মাওয়ার্দী পৃষ্ঠা-২২৪ নেহায়াতুল মুহতাজ ইলা শরহিল মিনহাজ খণ্ড-৭ পৃষ্ঠা-১৮২ ছাপা ১৯৪২ খৃ: আল আহকামুস সুলতানিয়া পৃষ্ঠা-২৬৩।

৭. মুঈনুল হুক্কাম ফি'মা য়াতারাদ্‌দাদু বায়নাল খাছমাইনি মিনাল আহকাম পৃষ্ঠা-১৮৯।

৮. তাবসারাতুল হুক্কাম ইবনে ফারহুন আলা হামশিন ফাতহুন আলাল মালিক খণ্ড-২ পৃষ্ঠা ৩২২ ও ৩৬৭ মাওয়াহিবুল জলীল খণ্ড-২ পৃষ্ঠা-৪৭ আত্‌তাশরীঈল জানাঈল ইসলামী, আবদুল কাদের আওদা পৃষ্ঠা-১৩০।

৯. নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ খণ্ড-৭ পৃষ্ঠা-১৭২-১৭৩, আসনাল মাতালিব খণ্ড-৪ পৃষ্ঠা-১৬২, আত্‌তাশরীঈল জানাঈল ইসলামী পৃষ্ঠা-১৩০-১৩১।

অনুবাদ : শহীদুল ইসলাম

ইসলামী মূল্যবোধের নিরিখে ভেজাল মজুদদারী ও মূল্যবৃদ্ধি

মুখলেসুর রহমান হাবীব

ভেজাল, মজুদদারী ও মূল্যবৃদ্ধি- এ তিনটি উপসর্গ দেশের বর্তমান মার্কেটিং সেক্টরকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে। পণ্য উৎপাদন ও তা সুলভ করার ক্ষেত্রে মুনাফা কেন্দ্রিক প্রবণতার আধিপত্যই এর জন্য দায়ী। অথচ বিশুদ্ধ ও মানসম্পন্ন খাদ্য, স্বচ্ছ-নির্মল ও দূষণমুক্ত পানির সহজ-লভ্যতা দেশের প্রতিটি মানুষের নাগরিক অধিকার। এই বৈধ ও স্বীকৃত অধিকার সকলের জন্য নিশ্চিত করা এবং অবাধ উন্মুক্ত করার প্রশ্নে সর্বপ্রকার নকল ও ভেজাল প্রতিরোধ, খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে উন্নত ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের অপরিহার্যতা সর্বোপরি সুলভ মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের সহজলভ্যতার বিকল্প নেই।

সামাজিক পরিমণ্ডলে, ব্যবহারিক জীবনে পণ্য ও মূল্যের বিনিময় ও আদান-প্রদান মানুষের স্বভাবগত ও চাহিদাবশত পেশা। জীবনধারণ ও জীবনযাপনের অপরিহার্য অধ্যায়। সংগত কারণেই প্রতিটি মানুষ প্রতিটি মুহূর্তে ক্ষুধা ও অভাব মেটাতে পর্যাপ্ত কেলোরী ও পুষ্টিসমৃদ্ধ এবং খাঁটি ও তরতাজা খাদ্য-পানি যেন অনায়াসে ভোগ করতে পারে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করা আবশ্যক। কিন্তু বাস্তবতা তার বিপরীত। কেননা একদিকে ব্যবসায়ী মহলের ভেজাল-প্রবণতার ফলে ভোক্তা-শ্রেণী পঁচা-বাসী, ক্ষতিকর-বিষতুল্য খাবার গলধকরণ করে কিডনি রোগ, বক্ষব্যাধি, যকৃতপ্রদাহ ও কোষ্ঠকাঠিন্যসহ ভয়ংকর ও দীর্ঘমেয়াদী সব দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে চরম দুর্বিসহ জীবন যাপনে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে স্বার্থকেন্দ্রিক মজুদদারীর ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বেড়ে তা মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের ভোক্তা সাধারণের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। চড়ামূল্যে জন-জীবনে নেমে আসছে নাভিশ্বাস। জাতীয় অর্থনীতির গতিময়তায় নেমে আসছে মন্দা ও স্থবিরতা। মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত অর্থনীতির এই অসংগতিপূর্ণ সমস্যাগুলোর রূপরেখা ও বাস্তবোচিত চিত্রায়ন, সমাজ-জীবনে তার নেতিবাচক প্রভাব ও ক্ষতিকর দিক এবং তা প্রতিরোধে প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইনের অবস্থান ও উপযোগিতা-শীর্ষক আলোচনা স্থান পেয়েছে বক্ষমান নিবন্ধে।

ভেজাল মজুদদারী ও মূল্যবৃদ্ধির রূপরেখা

ভেজালের যথাযথ অর্থ নকল। যা খাঁটি নয়। বিশুদ্ধ নয়। খাঁটি বস্তুর সাথে অবাঞ্ছিত মিশেল বস্তু। আসলের সাথে নকলের এবং উৎকৃষ্টের সাথে নিকৃষ্টের সংমিশ্রণ। খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের অর্থ-

---

লেখক : শিক্ষক, গবেষক ও প্রাবন্ধিক।

আকার-আকৃতিগত মিল রক্ষা করে খাদ্যের সাথে রং ও অন্যান্য অখাদ্য-কুখাদ্য মেশানো। একই জাতীয় পণ্যের ভালোর সাথে মন্দের, উন্নতমানের সাথে নিম্নমানের এবং দামীর সাথে সস্তার মিশ্রণ যেমন ভেজাল, তেমনি দামী পণ্যের বাহ্যিক প্রদর্শনীর অন্তরালে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের ও স্বল্পমূল্যের পণ্য কৌশলে বিক্রি করাও ভেজাল। একই কথা প্রযোজ্য হবে যদি পণ্যস্তূপের উপরিভাগে উন্নত ও আকর্ষণীয় দ্রব্য সাজিয়ে রাখা হয় আর ওগুলোর নীচে খারাপ ও দূষিত পণ্য রেখে সবগুলো একই মূল্যে বিক্রি করা হয়। বিশেষত পণ্যের গায়ে আকর্ষণীয় রং ও কালার ব্যবহার করে তা চমকপ্রদ করে তোলা, যাতে ক্রেতা সেই রংকে আসল মনে করে প্রত্যারিত হয়- ভেজালের একটি অভিনব রূপ।

মজুদদারী অর্থ, সঞ্চয় করা। ধরে রাখা। নির্দিষ্ট মৌসুমের চাহিদাপূর্ণ পণ্য পর্যাপ্ত পরিমানে অগ্রিম কিনে রাখা এবং তা গুদামজাত করে আটকে রাখা। যাতে সময়মত ভোক্তা শ্রেণীর চাহিদা ও অভাবগত দুর্বলতার সুযোগে চড়া মূল্যে সেগুলো বাজারজাত করে একচেটিয়া মুনাফা হাতিয়ে নেয়া যায়। শীত মৌসুমকে সামনে রেখে গরম পোশাক, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরম উপলক্ষে রেফ্রিজারেটর জাতীয় দ্রব্যসামগ্রী, অত্যন্ত চাহিদাপূর্ণ ও ব্যয়বহুল মাস রমযানের আগমনকে কেন্দ্র করে যাবতীয় কাঁচা মালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে পোশাক ও বস্ত্র এবং প্রসাধনী ও অলংকার সামগ্রী আর কুরবানীর জন্য পেঁয়াজ, আদা সহ যাবতীয় মসল্লাদি প্রচুর পরিমাণে অগ্রিম কিনে তা বাজারে না ছেড়ে আটকে রাখা। অতপর নির্দিষ্ট ও প্রতীক্ষিত সময় যখন ঘনিয়ে আসে আর সেই পণ্যের মূল্য ধারণাতীতভাবে বেড়ে যায় তখন তা বাজারে ছেড়ে স্বাভাবিক মূল্য অপেক্ষা দেড়গুণ-দ্বিগুণ বেশি মূল্যে বিক্রয় করা এবং এককভাবে রাতারাতি কোটি টাকার মালিক হওয়া মজুদদারীর চমৎকার নমুনা। এমনিভাবে চলমান অর্থনীতির স্বাভাবিক আবর্তন ও গতি ব্যাহত করে বাজারে কৃত্রিমভাবে পণ্যের চাহিদা ও উপযোগ সৃষ্টি করার হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে দ্রব্যাদি গুদামদজাত করাও মজুদদারী।

পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির অর্থ হলো, ব্যবসায়ী মহলে দ্রব্যমূল্যের সুনির্দিষ্ট তালিকা না থাকা। কিংবা তালিকা থাকলেও তাতে মূল্য নিয়ন্ত্রণকারী ও সময়োপযোগী নীতিমালা ও পরিকল্পনা না থাকা। এবং একই সাথে তার সুষ্ঠু তদারকীর জন্য নিরপেক্ষ কোন টিম না থাকা যারা জবাব-দিহিতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার দায়ে দায়বদ্ধ থাকবে।

দেশের অধিকাংশ নাগরিক বিশেষত নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের নাগালের বাইরে দ্রব্যমূল্য চলে গেলে অথবা এর জন্য তারা অসহনীয় সমস্যায় নিপতিত হলে তাকে 'চড়া মূল্য' সাব্যস্ত করা হবে। একই মানসম্পন্ন দ্রব্য যে দামে নিয়মিত বিক্রি হয়ে আসছে তা বিশেষ সময় বা বিশেষ গ্রাহক শ্রেণীর আগমনের ফলে অপেক্ষাকৃত বেশি মূল্যে বিক্রি করা হলে তাও মূল্যবৃদ্ধি বা চড়ামূল্য বিবেচিত হবে।

ভেজাল পণ্য সামগ্রী

ভেজাল পণ্যের সীমা-পরিসীমা নেই। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অধিকাংশ বাজারে এখন ভেজালের রমরমা অবস্থান। অন্তত বাংলাদেশে ভেজালের ভয়াল দৌরাত্ম্য ধীরে ধীরে আগ্রাসীরূপ

ধারণ করছে। সুতরাং এ দেশের হাটে-বাজারে যে সব খাদ্যদ্রব্য ও পণ্যসামগ্রীতে ভেজাল দৃষ্টিগোচর হচ্ছে তার মৌলিক ধারণা রাখা দেশের সকলের নাগরিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ববোধের বিকাশ ঘটাতেই আমরা চলমান ভেজাল পণ্যের একটি সুবিন্যস্ত বিবরণী তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছি।

সাম্প্রতিক কালে দেশের শীর্ষ দৈনিকগুলোতে ভেজাল-সংক্রান্ত ধারাবাহিক সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে। সংবাদ প্রতিবেদনে যে সব পণ্যে ভেজাল মেশানোর চিত্র ফুটে উঠেছে, তা অনেকটা নিম্নরূপ।

চাল, ডাল, আটা, লবণ নিত্যভোগ্য সামগ্রী। এর একটাও নকল বা ভেজালমুক্ত নয়। বেশি দামী চালের সাথে কমদামী চালের মিশ্রণ, কংকর মিশ্রণ, ঢেঁকিছাঁটা চালের নামে সাদা চালে বিষাক্ত রঙয়ের মিশ্রণ, কম দামের মোটা চাল কলে ভেঙ্গে বা ছেঁটে বেশি দামের সরু চাল বানানো রীতিমত সাধারণ ঘটনা। একই ভাবে বেশি দামের ডালের সঙ্গে কমদামের ডালের মিশ্রণ, বেশি দামের দেশী ডাল বানানোর জন্য বিদেশী ডালের সঙ্গে ক্ষতিকর রং-এর মিশেলও নতুন কোন ব্যাপার নয়। আর আটায় খড়িমাটির মিশ্রণতো সাধারণ ঘটনা। আয়োডিনযুক্ত লবণ নিয়ে বিজ্ঞাপন জগতে ডামাডোল হয়। অথচ ৯৫ শতাংশ ব্রান্ডের লবণে আয়োডিন নেই কিংবা থাকলেও পরিমাণমত নেই। মাছ, গোশ্‌ত, ডিম, দুধ আমাদের দৈনন্দিন খাবার দাবারের প্রধান আইটেম। কিন্তু এগুলোতেও থাকে পর্যাপ্ত ভেজাল। তাজা, মরা ও শুঁটকি সব ধরনের মাছেই নানা কেমিক্যাল ও রঙ ব্যবহার করা হয়। তাজা মাছে রঙ লাগানো হয় যেন তা সুন্দর চকচকে দেখায়। মরা মাছে রং ছাড়াও ব্যবহার করা হয় ডিডিটিসহ বিভিন্ন কেমিক্যাল, পচন ঠেকানোর জন্য ব্যবহার করা হয় ফরমালিন নামের মারাত্মক কেমিক্যাল। শুঁটকিতে ডিডিটি, ইঁদুর মারার ওষুধ ব্যবহার করা হয় অবলীলায় আর গোশ্‌ত চেনা তো জটিল ব্যাপার। কোনটা ভেড়ার গোশ্‌ত আর কোনটা খাসির আর কোনটাইবা কুকুরের; কোনটা মহিষের আর কোনটা গরুর তা শনাক্ত করা সহজ ব্যাপার নয়। খাসির নামে ভেড়ার আর গরুর নামে মহিষের গোশ্‌ত দিব্যি বিক্রি হচ্ছে। গত ১৫ই আগষ্ট ২০০৫ ইং এর দৈনিক নয়া দিগন্তে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে এক অবাককরা সংবাদ- 'কয়েক বছর আগে রাজধানীর অদূরে আরিচা ঘাটে খাসির মাংসের নামে কুকুর জবাই করার সময় জনতার হাতে আটক হয়েছিল এক অসৎ ব্যবসায়ী। আটক ব্যবসায়ী থেকে জানা গেছে- 'দীর্ঘদিন ধরে এটা চলে আসছে।'

কয়েক মাস আগে রাজধানীতে মরা মুরগী হোটেলে বিক্রিকালে গ্রেফতার হয়েছে এক সিন্ডিকেটের কয়েক জন। চক্রটি গ্রেফতার হওয়ার পর বেরিয়ে আসে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। রাজধানীর অদূরে সাভার এলাকা সহ কয়েকটি জেলা থেকে কয়েক হাজার মরা মুরগি প্রতি দিন বিভিন্ন হোটেলে সরবরাহ করা হচ্ছে কয়েক বছর ধরে। সস্তা দামে জিনিস পেয়ে কিছু হোটেল মালিকও তা দিয়ে খাবার তৈরি করে বিক্রি করছে অবাধে। প্রকাশিত আরেক খবরে বলা হয়েছে, কুরবানীর সময় হলে গরু ব্যবসায়ীরা গরুর দেহ হৃষ্টপুষ্ট ও মোটা করতে কৃত্রিম পন্থা বেছে নেয়। জানা গেছে কুরবানীর এক-দু' মাস আগে তারা বিষাক্ত এক জাতীয় মেডিসিন গরুর দেহে ইনজেক্ট করে। ফলে তা অল্প

দিনে অস্বাভাবিক ভাবে মুটিয়ে যায়। এক বছরের গরু তখন দুই বছর বয়সী মনে হয়। আরো চাঞ্চল্যকর ব্যাপার হল, ঐ গরু কুরবানী করা না হলে মেডিসিনের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তা দুই- তিন মাসের মাথায় মরে যায়।

ডিমের মধ্যে ভেজাল হয় একথা হয়ত কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, এই ডিমেও ভেজাল হয়। দেশী মুরগির ডিমের দাম বেশি। ফার্মের মুরগির সাদা ছোট ডিম কেমিক্যাল মিশিয়ে হুবহু দেশী মুরগির ডিম বানিয়ে বিক্রি করা হয়। দুধে পানির মিশ্রণ তো পুরনো কথা। পানিতে গুড়ো দুধ এমনকি মেয়াদোত্তীর্ণ গুড়োদুধ মিশিয়ে 'গরুর খাঁটি দুধ' বানানো হয়। এবং অবাধে বিক্রিও করা হয়।

যে ডিডিটি-কীটনাশক অত্যন্ত ক্ষতিকারক বিষ বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কৃষি ক্ষেত্রে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে, সেই ডিডিটি এদেশে শুঁটকি মাছে ব্যবহার করা হচ্ছে, যাতে মাছ নষ্ট না হয়ে যায়।

চিড়া-মুড়ি এদেশের মানুষের মুখরোচক শুকনো খাবার। অথচ এগুলোতেও ভেজালের 'করাল গ্রাস' বিদ্যমান। ক্ষতিকর ইউরিয়া দিয়ে মুড়ি ভাজা হয়। আর বিষাক্ত পাউডার ব্যবহার করে চিড়াকে ধবধবে সাদা করা হয়। যা খেলে ডায়রিয়া, উদরাময়সহ নানা জঠরপীড়ায় ভুগতে হয়।

আইসক্রিমে নিষিদ্ধ সোডিয়াম সাইক্লোমেট ব্যবহার করা হয় যা ক্যান্সার রোগ সৃষ্টি করার পাশাপাশি কিডনি ও লিভার নষ্ট করে। তাছাড়া পুরনো প্যাকেট ও কাঠিসহ মেয়াদোত্তীর্ণ আইসক্রিমকে রিসাইক্লিন করে নতুন আইসক্রিম বানিয়ে বাজার জাত করা হয়।

সরিষা, সয়াবিন, ঘি, বাটার অয়েল কোনটার মধ্যেই খাদ্যমান ও খাঁটিত্বের নিশ্চয়তা নেই। সরিষার তেল বলে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের যে সব তেল বাজারে পাওয়া যায় তার কোনটিই খাঁটি সরিষার তেল নয়। সয়াবিন তেলের সঙ্গে রঙ, কেমিক্যাল ও সরিষার তেলের গন্ধযুক্ত তরল উপকরণ মিশিয়ে এ সব 'সরিষার তেল' তৈরি করা হয়। সয়াবিন তেল খাঁটি, কোলস্টরেলমুক্ত ইত্যাদি বলে বিক্রি করা হচ্ছে। অথচ এর মধ্যে পাম অয়েল ডালডা ইত্যাদির মিশ্রণ থাকে। তাছাড়া ডালডাও নকল ও ভেজাল মুক্ত নয়। আর 'ঘি'-এ দুধের কোন সংশ্রব নেই। ময়দা, ডালডা, রঙ ও ঘি' র সুগন্ধ যুক্ত তরল উপকরন মিশিয়ে তৈরি হয় 'খাঁটি গাওয়া ঘি'। বাটার অয়েল মোটেই বাটার অয়েল নয়। বিভিন্ন পশুর চর্বি ও অন্যান্য নানা উপকরণ মিশিয়ে বানানো হয় বাটার অয়েল।

শাক-সবজি, তরিতরকারিতে মেশানো হচ্ছে নানা কেমিক্যাল, রঙ এবং বিভিন্ন ক্ষতিকর উপাদান। এমনিতেই উৎপাদন পর্যায়ে ব্যাপকভাবে সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে শাক-সবজি, তরিতরকারির মান নিম্ন থেকে নিম্নতর; এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়ে যাচ্ছে। এ সত্ত্বেও এসবকে সজীব, সুশ্রী ও দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য দ্বিতীয় দফা প্রয়োগ করা হচ্ছে বিষাক্ত সব কেমিক্যাল, রং সহ আরো অনেক কিছু।

আমরা যে প্রতিনিয়ত দেশী-বিদেশী ফল খাচ্ছি তাও যথার্থ উপযুক্ত ও মানসম্পন্ন নয়। কাঁচা ফলে রং কেমিক্যাল মিশিয়ে চকচকে রাখা হয়। অনুরূপ ভাবে রং ও কেমিক্যালের সাহায্যে তা পাকানো হয়। বিষাক্ত পাউডার ইনজেক্ট করে বড় বড় কাঁঠাল পাকানো হয়। আম, কলা, পেঁপে থেকে শুরু

করে এমন কোন দেশী ফল নেই যা কেমিক্যাল মিশিয়ে পাকানো হচ্ছে না। আপেল, কমলা, আংগুর সহ প্রায় সব ধরনের বিদেশী ফল সংরক্ষণ করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে নানা ক্ষতিকর উপাদান।

মিষ্টি দধির মহা ধুমধাম আমাদের দেশে, শহরে গঞ্জে সর্বত্র মিষ্টি ও দধির অসংখ্য দোকানে রকমারি আইটেম রুচীবান সে কাউকে আকৃষ্ট করবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ভেজালের আধিপত্য বিরাজমান। ৯৫ শতাংশ মিষ্টিতে দুধের ছানার কোন সম্পর্ক নেই। দধির ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য।

তাছাড়া বিস্কুট, কেক, চানাচুর সকলের কাছেই প্রিয়। বিশেষত শিশুদের কাছে। অথচ এগুলো তৈরি হয় মেয়াদোত্তীর্ণ আটা-ময়দা, পচা ডিম, রঙ ও কেমিক্যাল দিয়ে। চানাচুর তৈরিতে বিষাক্ত মবিলের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার বিস্ময়কর হলেও সত্য।

বিভিন্ন কোমল পানীয়তে এনার্জি-বর্ধক কোন উপাদান নেই। আছে কেবল রঙ ও কেমিক্যাল। একই কথা বিভিন্ন ফলের জুসের ক্ষেত্রেও। এগুলো পান করে কোন লাভ তো হওয়ার প্রশ্নই উঠে না, উল্টো দেশের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ষোলআনা।

মিনারেল ওয়াটার নিয়ে কিছুদিন পূর্বে ঢাকার একটি দৈনিক ধারাবাহিক সচিত্র সংবাদ পরিবেশন করেছে। যারা ও সব প্রতিবেদন পড়েছেন তারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন যে, ঐ পানি মিনারেল ওয়াটার তো নয়ই, এমনি বিশুদ্ধ পানিও নয়। ওয়াসার নোংরা পানি বোতলে ভরে 'মিনারেল ওয়াটার' নামে নির্বিবাধে ব্যবসা চলছে।

ভেজাল বিরোধী অভিযান

ভেজাল খাদ্য-বিরোধী অভিযান একটি প্রশংসিত ও যুগান্তকারী উদ্যোগ। জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ও তাদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন-পুষ্ট এই অভিযান তাই ইতিমধ্যে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে খাদ্য-পণ্য ও পানীয়তে ভেজাল ও নকলের কদর্যতা চলছিল নির্বিবাধে, অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল অসাধু ব্যবসায়ী চক্রের এমন নীতিহীনতা, অসততা ও দুর্বৃত্তাচার রোধ করার, তাদের শাস্তি দেয়ার এবং মানসম্পন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত খাঁটি খাদ্যদ্রব্য পানীয় ও পণ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানের কেউ নেই। অবশেষে প্রিন্ট মিডিয়ার বিশেষ উদ্যোগ ও আন্দোলনমুখী ভূমিকার সুবাদে এবং গণমত ও জনচাপকে গুরুত্বে এনে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভেজাল বিরোধী অভিযান শুরু করেন।

গত জুলাই মাসে ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিক তার প্রথম পাতায় ধারাবাহিকভাবে এই 'মোবাইল কোর্ট' অভিযানের খবর চাপাতে শুরু করে। তারপর প্রিন্ট মিডিয়ার সকল পত্র পত্রিকায় খুব জোরেশোরে তা কভারেজ পায়। সে খবরে, অভিযানকারীরা খাদ্যদ্রব্য, পানীয় ও পণ্য উৎপাদক ও বিক্রেতাদের ঠিকানায়, কারখানায় ও দোকানে হানা দিয়ে পিলে চমকানো যে চিত্র উন্মোচন করেছেন তা একই সংগে বিস্ময়কর ও চরম উদ্বেগজনক। তারা এ যাবৎ কোথাও খাঁটি, মানসম্পন্ন ও স্বাস্থ্যকর কোন কিছু খুঁজে পাননি। হোটেলের রান্নাকরা খাদ্য, মিষ্টিজাত দ্রব্য, বেকারি আইটেম,

ভোজ্য তেল, প্যাকেটজাত ফলের রস, কাঁচা তরিতরকারি, মাছ-গোশত, চাল-ডাল, ফলমূল থেকে নিয়ে বোতলজাত বিশুদ্ধ পানিতে পর্যন্ত ভেজাল মেশানোর সংবাদ প্রকাশিত হয়। 'দীর্ঘদিন ধরে আমরা ভেজাল খাদ্য খাচ্ছি'- এমন অভিযোগ শোনা গেলেও গুলশান, ধানমন্ডি ও মতিঝিলের বিলাসবহুল চাইনিজ, থাই, ইন্ডিয়ান ও মালয়েশিয়ান খাবারের রেঁস্তরায় রঙ বেরঙের সাইনবোর্ডের আড়ালে যে নোংরা, বিষাক্ত ও ভেজাল খাদ্য দ্রব্য মানুষ খাচ্ছিল তা সম্প্রতি সময়ে চলমান ভেজাল বিরোধী অভিযানে সাধারণ মানুষের কাছে কিছুটা হলেও প্রকাশ পেয়েছে। ভেজাল খাদ্য তৈরি ও বিপণনের তালিকায় হোটেল, রেঁস্তোরা, রেস্টুরেন্ট ও ফাস্ট ফুডের নামকরা অভিজাত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই বেশি।

এ যাবৎ ভেজাল বিরোধী অভিযানকারীরা রাজধানীর বেশ কয়েকটি নামী-দামী হোটেল-রেস্তোরা ও ফাস্ট ফুডের দোকানে অভিযান চালিয়ে দেখেছেন, সেখানে খাদ্য দ্রব্য তৈরির পরিবেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। এব্ং তৈরি খাবার নিম্নমানের ও খাওয়ার অনুপযুক্ত। খাদ্য উপকরণ এবং তাতে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদান স্বাস্থ্যের জন্য ভয়াবহ ক্ষতিকর। মরা মুরগি, টয়লেটে থালা-বাসন, খাবারের সাথে ফরমালিন মিশ্রণ, খাবার তৈরির কক্ষে তেলাপোকা, ঘর জুড়ে মাকড়সার জাল, পচা-দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশ এখন পরীক্ষিত সত্য। সাভারের খোদ পর্যটন কর্পোরেশনের এক রেস্তে াঁরাতে বাসি ও অস্বাস্থ্যকর খাবার পেয়ে বত্রিশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। আরেক মিষ্টির দোকানে অখাদ্য একশত মন মিষ্টি ফেলে দেয়া হয় ড্রেনে। বোবিদাসঘাটস্থ এক চানাচুর ও সেমাই কারখানায় হানা দিয়ে পাওয়া গেছে কয়েক বস্তা পচা-দুর্গন্ধযুক্ত চানাচুর, সেমাই, মোবিল মিশ্রিত বিষাক্ত তেল, পচা ও ফাঙ্গাস পড়া পাউরুটি ইত্যাদি। দেখা গেছে মলমূত্র ত্যাগের স্থানেই ওরা সারে সমস্ত ধোয়া-মোছার কাজ। এর মালিককে বিশ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। যাত্রাবাড়ীর একটি কারখানা সয়াবিন, সরিষার তেল, বিস্কুট, জুসসহ প্রায় ত্রিশটি ভোগ্যপণ্য নকল করে তৈরি ও বাজারজাত করে আসছিল। এর মালিককে পঞ্চাম হাজার টাকা জরিমানা ও তিন মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়। উত্তরায় বিভিন্ন ফাস্টফুড ও মিষ্টির দোকানে অভিযান চালিয়ে একদিনেই জরিমানা করা হয় এক লাখ বিশ হাজার টাকা। পুরনো ঢাকায় নাজিমুদ্দিন রোডস্থ এক বিখ্যাত লজেন্স ফ্যাক্টরিতে হানা দিয়ে দেখা গেছে যে, সেখানে শিশুদের প্রিয় খাদ্য লজেন্সে পাঁচ ধরনের বিষাক্ত রং এবং দশ বারো ধরনের অত্যন্ত ক্ষতিকারক কেমিক্যালের ভেজাল মিশ্রণ করা হয়। অন্য আরেক জায়গায় অভিযান চালিয়ে দেখা গেছে, ময়লা দুর্গন্ধময় ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিষাক্ত কেমিক্যাল মিশিয়ে তৈরি হয় দেশের বিখ্যাত এক ফ্যাক্টরির মিষ্টি। সেখানে আরো দেখা গেছে, আলু ও মিষ্টি কুমড়ার সঙ্গে পশুর চর্বি মিশিয়ে তৈরি হয় 'ঘি' এবং নিম্নমানের লাচ্ছা সেমাই। ঢাকার সোয়ারী ঘাটের কয়েকটা ফুড ফ্যাক্টরিতে গিয়ে দেখা গেছে ময়লা বস্তায় বিস্কুট তৈরির পচা খামির রাখা হয়েছে এবং বুড়িগঙ্গা নদীর নোংরা ময়লা পানি পাইপের মাধ্যমে এনে বিস্কুট তৈরির কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। চট্টগ্রামে এক ব্রান্ডের আচারের কারখানায় রাখা ড্রামে দেখা গেছে পোকা ও ছত্রাক কিলবিল

করছে। এছাড়া আরো বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে ভেজাল ও নকলের কুৎসিত ও বীভৎস চেহারা উন্মোচন করছেন অভিযানরত মোবাইল কোর্ট কর্মকর্তাগণ। পরিশেষে আমরা সরকার ও মোবাইল কোর্ট কর্তৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন এবং কামনা করি তাদের ভেজাল বিরোধী এই অভিযানের ধারাবাহিকতা ও উত্তরোত্তর সাফল্য।

ভেজালের বিরূপ প্রভাব

নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের খাদ্যদ্রব্য, পানীয় ও পণ্য কিনে ক্রেতা-সাধারণ কেবল আর্থিক ভাবেই ঠকছে না, এ সব খেয়ে ও পান করে ভয়াবহ রোগ-ব্যাধিতে সবাই আক্রান্ত হচ্ছে। চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের মতে নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের খাদ্যদ্রব্য খেয়ে শিশু, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সকলে ক্যান্সার, হৃদরোগ, কিডনি ও লিভারের গোলযোগ, জন্ডিস, চর্মরোগ এবং কলেরা, আমাশয়সহ বিভিন্ন পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হচ্ছে অহর্নিশ। বিশেষ করে পাকস্থলির ক্যান্সার রোগ বেড়ে চলছে উদ্বেগজনক হারে। ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্ত চাপের রোগীও বাড়ছে। কিডনি বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন যে, দেশে বর্তমানে দু' কোটিরও বেশি কিডনি রোগী রয়েছে। দেশে সরকারী বেসরকারী হাসপাতালের সংখ্যা ও সেগুলোর শয্যাসংখ্যা অধিকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তা সত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান রোগীর সংখ্যা যতখানি বাড়ছে সে তুলনায় হাসপাতাল ও শয্যাসংখ্যা সীমিত ও অপ্রতুল। এছাড়া রোগ আরোগ্যের হারও ক্রমশ কমে আসছে। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের মত দেশগুলোর অসংখ্য মানুষ মারা যাবে নানা জটিল ব্যাধির শিকার হয়ে। আর এর কারণ হলো, ভেজাল ও বিষাক্ত খাদ্য, অখাদ্য ও কুখাদ্য। কেননা ভেজাল ও বিষাক্ত খাদ্য মানুষের কিডনিকে অচল করে দেয়। ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, আলসার, ক্যান্সার ইত্যাদি নানা জটিল রোগের জন্ম দেয়। এমনকি মানবদেহে ওষুধের কার্যকারিতা পর্যন্ত নষ্ট করে দেয়। ওষুধ সেবনে সুফল না পাওয়ার অন্যতম কারণ এটাই।

আমেরিকায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের কিডনি রোগ সংক্রান্ত এক জরিপে বলা হয়েছে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ২০২৫ সাল নাগাদ কিডনিরোগ মহামারী আকার ধারণ করবে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ এ দেশের জনগণ সম্পর্কে একই মতামত ব্যক্ত করেছেন, বরং ২০২৫ এর আগেই এদেশে কিডনি রোগ ভয়াবহ আকার ধারণ করবে বলে তারা আশংকা প্রকাশ করেছেন। প্রকাশিত এক খবরে চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞদের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রতিদিন রাজধানীর হাসপাতাল গুলোতে বিপুল সংখ্যক শিশু হাত-পা ও মুখ ফোলা, পেটে পানি উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হচ্ছে। কয়েক বছর আগে এমন প্রাথমিক উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর কয়েকদিন চিকিৎসা দেয়া হলে তারা সুস্থ হয়ে ফিরে যেতো। আর এখন বিদেশী ওষুধ দিয়েও সুস্থ হতে অনেক সময় লাগে কিংবা সুস্থতার সম্ভবনা খুব কম থাকে। কারণ ভেজাল ও বিষাক্ত খাবারের টাকসিন মানব দেহে অক্ষত থেকে যায় এবং ধীরে ধীরে কিডনি ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নষ্ট করে ফেলে। রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত ফাস্ট ফুড শিশুরাই বেশি খায়।

বয়স্কদের মধ্যে পরিচালিত এক সার্ভের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, কিডনি রোগীদের শতকরা ৭৫ ভাগই জানেনা যে, তারা কিডনি রোগে আক্রান্ত এবং এদের কিডনি তাদের অজ্ঞাতে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই কিডনি নষ্টের জন্য ভেজাল ও বিষাক্ত খাবার সিংহভাগ দায়ী। ভেজাল ও বিষাক্ত খাবারের আর্সেনিক, লেদ, মার্কারি, কাপারের মত পদার্থ মানুষের রক্তে মিশে যায়। কিডনির ফিল্টার করণে আবর্জনা সরে গেলেও এ সব বিষাক্ত পদার্থ থেকে যায়। আর এগুলোই মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আঘাত হেনে তাকে মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছে দেয়।

ভেজালরোধে প্রচলিত আইন

বর্তমানে যে আইনে ভেজাল খাদ্য বিরোধী অভিযান চলছে তা অনেক পুরনো। ১৯৫৯ সালে প্রণীত বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশের অধীনে ভেজাল খাদ্যের শাস্তি হিসেবে সর্বোচ্চ চার হাজার টাকা ও এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। বর্তমান সময়ের বিবেচনায় এই আইনটি খুবই সেকেলে ও গুরুত্বহীন। জনস্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বিষয়ে এ ধরনের লঘু শাস্তি খুব বেশি সুফল বয়ে আনবে না। এই আইনের প্রয়োগ থাকার সুযোগে ভেজাল খাদ্য উৎপাদন ও পরিবেশনকারীরা লঘু শাস্তিকে উপেক্ষা করে কোটি কোটি টাকার ভেজাল পণ্য বাজারজাত করে যাচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলার কোন উপযোগিতাই এই আইনের নেই। সংগত কারণেই পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার দশটি মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে ষোল সদস্যের একটি খাদ্য নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন করার বিষয়ে ভাবছে। আর ভেজাল ও নিম্নমানের খাদ্য তৈরি, নোংরা পরিবেশ ইত্যাদির জন্য তিন মাস থেকে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও সর্বোচ্চ তিন লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান খসড়া করে সরকারের আইন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ ১৯৫৯ কে সংশোধন করে 'বাংলাদেশ বিশুদ্ধ খাদ্য (সংশোধন) আইন ২০০৫' জারি করার সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। এ খসড়ায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্ত করার এখতিয়ারও দেয়া হয়েছে পরিদর্শক ও সরকারের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে। তাদের কাজে বাধা দেয়া হলে ছয় মাসের কারাদণ্ড ও দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানার প্রস্তাব করা হয়েছে। একটি পৃথক আদালতে সংক্ষিপ্ত বিচারের বিধানও করা হচ্ছে। একই সাথে খাদ্যের নমুনা পরীক্ষার নামে একশ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর সময় ক্ষেপণের বিষয়টি মাথায় রেখে ৬০ দিনের রিপোর্ট ৭ দিনে বা জরুরি প্রয়োজনে ২ দিনের মধ্যে জমা দেয়ার বিধান করা হচ্ছে। যা হোক সরকার ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন আইন ২০০৫ কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

ভেজালরোধে প্রচলিত (সংশোধন) আইনের পর্যালোচনা

১৯৫৯ সালের বিশুদ্ধ খাদ্য দ্রব্য অধ্যাদেশ সংশোধন করে প্রস্তাবিত যে নতুন অধ্যাদেশের খসড়া প্রণীত হয়েছে তা যথেষ্ট কঠোর কি-না এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কেননা ভেজাল ও বিষাক্ত খাদ্যদ্রব্য যারা প্রস্তুত করে ও বিপণন করে তাদের এই অপকর্মের ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকারক প্রভাব-

প্রতিক্রিয়া ভোক্তা সাধারণের শরীর-স্বাস্থ্য এমন কি জীবনের জন্য ব্যাপক ও মারাত্মক হুমকি-স্বরূপ। দ্বিতীয়ত খাদ্য এমন এক পণ্য সামগ্রী যার বিশুদ্ধতা কোন অবস্থাতেই ক্ষুণ্ন করার কোন সুযোগ থাকতে পারে না। কাজেই এই অপরাধের মাত্রা অন্যান্য সাধারণ অপরাধের নিরিখে নির্ণয় করা কতটা সমীচীন হবে এটাও ভেবে দেখতে হবে।

তিন মাস থেকে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড কি আদৌ কোন কঠোর ব্যবস্থা? এটাই যদি কঠোর ব্যবস্থা হয় তাহলে লঘু ব্যবস্থা কোনটি? ১৫ কোটি আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে নিশ্চিত দুর্ভোগ ও অকালমৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় যারা, ওই সব খাদ্য সন্ত্রাসীর শাস্তি যদি হয় মাত্র তিন মাস থেকে তিন বছরের জেল, তাহলে ২/৪ জন বা মাত্র একজন মানুষ খুনের আসামীকে ফাঁসি দেয়া হবে কোন যুক্তিতে? এই খাদ্য- ভেজালকারীদের জন্য বাংলাদেশের ১৫ কোটি মানুষের মধ্যে সম্ভবত এমন একজনও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে, যিনি কোন না কোন পেটের পীড়ায় আক্রান্ত নন। এমন কি কোন ডাক্তারও এ উপসর্গ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নন। দেশের ৯৫% ডায়রিয়া, উদরাময় আমাশয় ইত্যাদি পেটের পীড়া, কিডনি, লিভার ও হার্টের ব্যাধি এবং টাইফয়েড, জন্ডিস, ডায়াবেটিস ও ক্যান্সারের জন্য দায়ী এরা। একটা দেশের গোটা জনস্বাস্থ্যকে যারা ধ্বংসের এই বধ্যভূমির দিকে ঠেলে দিচ্ছে তাদের কঠোর শাস্তি মাত্র ৩ মাস থেকে ৩ বছরের জেল? একজন সন্ত্রাসী বা একজন খুনী মানুষ খুন করে যে অপরাধ করে মাত্রার গুরুত্ব ও ভয়াবহতার প্রশ্নে তারচে শতগুণ বেশি অপরাধ করে খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণকারী ও তা বিক্রয়কারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। কেননা সন্ত্রাসী বা খুনীর আক্রমণের শিকার হয় নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠী। পক্ষান্তরে খাদ্য সন্ত্রাসী বা খুনীর আক্রমণের শিকার হয় নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠী। পক্ষান্তরে খাদ্য সন্ত্রাসীদের ভেজাল আক্রমণের শিকার হয় নির্বিশেষে সকলে। গোটা সমাজ এফেক্টেড হয়। তারা ভেজাল খাদ্য তৈরি ও সরবরাহ করে সমাজ ও দেশের সকল নাগরিকের মধ্যে এমন নিরব অথচ সক্রিয় ঘাতকের অনুপ্রবেশ ঘটায় যা কালক্রমে তাদের মারাত্মক অসুস্থতা ও অপমৃত্যুর নির্ঘাত কারণ হয়ে ওঠে।

এ ছাড়া সন্ত্রাসী হল ঘোষিত, চিহ্নিত অপরাধী। তাদের আক্রমণ আঁচ করা যায়, দেখা যায় বলে তার আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সতর্ক হওয়া যায় এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বা সামাজিক প্রতিরোধের সহায়তা চাওয়া যায়। কিন্তু ভেজাল ও বিষাক্ত খাদ্য প্রস্তুতকারী থাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে, অখ্যাতও নিভৃত আস্তানায়। তাকে শনাক্ত করা সাধারণ ভোক্তা শ্রেণীর কাছে যেমন কঠিন, তেমনি তাৎক্ষণিকভাবে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলাও দুরূহ ব্যাপার। কেননা ভোক্তা সাধারণ ভেজাল ও বিষাক্ত খাবার সম্পর্কে থাকে অজ্ঞ বা অসতর্ক। তাদের এই দুর্বলতার সুযোগেই প্রতারক ব্যবসায়ীচক্র খাদ্যে ভেজাল ও বিষ মিশিয়ে গোটা দেশবাসীকে প্রাণঘাতী ও আত্মঘাতী মরণব্যাধিতে আটকে ফেলেছে। একজন মানুষ যদি কাউকে অন্যায়ভাবে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে আর তা প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ কিংবা অপরাধীর স্বীকারোক্তিতে সুপ্রমাণিত হয় তাহলে আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করবেন। অথচ একই বিষ বা তার চেয়েও মারাত্মক ক্রিয়াশীল বিষাক্ত রঙ বা কেমিক্যাল খাদ্যে ইনজেক্ট করে অসংখ্য মানুষকে খাইয়ে তাদের স্বাস্থ্য ও

*ইসলামী আইনে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ আল্লাহ কতৃক নির্ধারিত। সঠিক প্রমাণ সাপেক্ষে বিচারক এ দণ্ডটি কার্যকর করতে পারেন।

জীবন হরণ করছে যারা তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি মাত্র তিন বছর জেল। বিষয়টি ভাবতেও অবাক লাগে। কেননা এই ভেজাল ও বিষাক্ত খাদ্য প্রস্তুতকারী ও বিপণনকারী কোন অংশেই একজন খুনী-সন্ত্রাসীর চেয়ে কম অপরাধী নয়। তাই খুনীর শাস্তির তুলনায় তার জন্য এত লঘু শাস্তির অধ্যাদেশ সত্যি অবিশ্বাস্য ও রীতিমত বিস্ময়কর।

ভেজাল সম্পর্কে ইসলাম যা বলে

ভেজাল সম্পর্কে ইসলাম কী বলে? এ ব্যাপারে ইসলামী আইনের দৃষ্টিভঙ্গি কী? সচেতন ও অভিজ্ঞ পাঠক মহল তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। মানব ও মানবতার কল্যাণ-সাধনে ব্যর্থ, অপূর্ণাঙ্গ মানব রচিত আইন যেখানে ভেজাল প্রতিরোধে অকার্যকর অধ্যাদেশ জারি করতে সোচ্চার, সেখানে আল্লাহ প্রদত্ত আইন– যার উপযোগিতা ও যথার্থতা পরীক্ষিত সত্য- ভেজাল প্রতিরোধে কতটা সক্রিয় হবে তা সহজেই অনুমেয়। এ কথা স্বতসিদ্ধ, ইসলাম ব্যক্তি বিশেষের সীমানা পেরিয়ে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ ও স্বার্থকে প্রাধান্য দেয় সর্বাগ্রে। সামাজিক কল্যাণ ও জনকল্যাণকে বিসর্জন দিয়ে নিছক ব্যক্তিস্বার্থকে ইসলাম প্রশ্রয় দেয় না।

ইসলাম তার অর্থ ব্যবস্থায় ক্ষতিকর পন্থা ও পদ্ধতির উদ্ভব কিংবা অনুপ্রবেশের সম্ভাব্য পথকে পুরোপুরিভাবে রুদ্ধ করে দিয়েছে। এমন কি ক্ষতিকর কোন সহায়তা লাভের পথও খোলা রাখেনি। এ জাতীয় সমুদয় ক্রিয়া-কর্মকে হারাম ও অবৈধ ঘোষণা করেছে। অন্যের ক্ষতি করে নিজে লাভবান হওয়ার সকল-প্রক্রিয়া, সকল প্রকার ক্ষতিকর চুক্তি ও অস্পষ্ট চুক্তি এবং পরিণামে বিবাদ-বিসম্বাদ পর্যন্ত গড়ায় এমন সব লেনদেনকে ইসলাম অবৈধ ও বাতিল বলে সাব্যস্ত করেছে। এবং ইসলামী সরকারের উপরও সব ধোকা ও প্রতারণামূলক কারবার সমূলে উৎখাত করার অপরিহার্য দায়িত্ব আরোপ করেছে।

ক্ষতিকর ও প্রতারণামূলক বাণিজ্য প্রক্রিয়া সমূহের মধ্যে প্রধান ও অন্যতম হল, ভেজাল পণ্য তৈরি ও সরবরাহ করা ও অসৎ উদ্দেশ্যে পণ্য গুদামজাতের মাধ্যমে মজুদ করা এবং একক মুনাফা লাভ করার উদ্দেশ্যে পণ্যমূল্য অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে দেয়া। যেহেতু উল্লিখিত প্রক্রিয়াগুলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত লাভের পথ সুগম করলেও তা দেশ ও সমাজের অসংখ্য মানুষের জন্য ভয়াবহ ধ্বংস ও বিপর্যয় ডেকে আনে এবং তাদের বঞ্চনা ও বিড়ম্বনার কারণ হয়, তাই এগুলো অন্তত ইসলামের নিরপেক্ষ আদালতের কঠোর আইনে ছাড় পেতে পারে না। জনস্বার্থের বৃহত্তর কল্যাণের খাতিরেই এই প্রক্রিয়াজনিত ক্রয়-বিক্রয়কে ইসলামী আইন ও বিচার বিভাগ বরাবরই অবৈধ ও হারাম ঘোষণা করে আসছে। তাহলে দেখা যাক ইসলামী আইনের উৎস কুরআন, হাদীস ও এজমা' এ সম্পর্কে কী বলে আল কুরআন ঘোষণা করেছে, 'হে মুমিনগণ! তোমরা অবৈধ পন্থায় পরস্পরের সম্পদ হস্তগত করো না। পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে কেবল বৈধ ব্যবসার মাধ্যমেই তোমাদের সম্পদের লেন-দেন হওয়া উচিত। আর তোমরা আত্মহত্যা বা আত্মধ্বংস করো না।' সুরা নিসা-২৯

এক দোকানে শস্যস্তূপের উপরাংশ শুকনো এবং নীচেরগুলো স্যাঁত স্যাঁতে ভেজা দেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি ভেজা শস্য উপরে রাখছ না কেন? যাতে ক্রেতা তা দেখে ক্রয় করতে পারে, প্রতারিত না হয়। শোন, যে আমাদের ধোকা দেয় সে আমার উম্মত নয়।' ইমাম তিরমিযী র. এই হাদীস উল্লেখ করে বলেন, 'হাদীসটি সহীহ, বিশেষজ্ঞ আলেমগণ তার উপর আমল করেন। তাঁরা ব্যবসায় ধোকা ভেজাল মিশ্রণকে ঘৃণা করেন এবং বলেন- 'পণ্যে ভেজাল মেশানো ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়া হারাম।'

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাজারে দেখলেন, এক ব্যক্তি শস্য বিক্রি করছে। তা তাঁর খুব পছন্দ হল। পরে তিনি স্তুপের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিলেন। দেখলেন, হাত ভিজে গেছে। তখন তিনি বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে শস্য ব্যবসায়ী! এ সব কী? সে বলল, বৃষ্টির পানিতে ভিজে গেছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- তাহলে তুমি এ ভিজা শস্যগুলো উপরে রাখলে না কেন? তখন ক্রেতারা তা দেখতে পেত। এতো ধোকা। যে আমাদের সাথে ধোকাবাজি করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।'

অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক খাদ্য বিক্রেতার কাছে গেলেন। সে খুব ভাল পণ্য নিয়ে বসেছিল। তিনি স্তুপের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিলেন। দেখলেন, নীচে খুব নিকৃষ্টমানের খাদ্য রয়েছে। তখন তিনি তাকে বললেন, 'উপরের ভালো খাবার আলাদা বিক্রি কর এবং নীচের নিকৃষ্টগুলো আলাদা বিক্রি কর। জেনে রাখ, যে আমাদের সাথে প্রতারণা করবে সে আমাদের মধ্যের কেউ নয়।'

'তুহ্‌ফাতুল আহওয়াযী' গ্রন্থে বলা হয়েছে; ইসলামী রাষ্ট্রে যারা পণ্যে ভেজাল মিশাবে এবং নকল দ্রব্য খাঁটি বলে বিক্রি করবে, ইসলামী আদালত তার ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করে দিবে। জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে বাজারে তার ক্রয় বিক্রয় অধিকারের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে ইসলামী সরকার।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন পাপিষ্ঠ ব্যবসায়ী' তথা যারা খাদ্যে ভেজাল মেশায়, ওজনে কম দেয়, মিথ্যা কথা বলে পণ্য বিক্রি করে, সর্বোপরি ক্রেতাকে ঠকায় তাদেরকে শাস্তির জন্য জড়ো করা হবে। তবে সে সব ব্যবসায়ী ছাড়া যারা ব্যবসার কাজে আল্লাহকে ভয় করে চলে, কথায় ও কাজে সৎ থাকে'।

কুরআন, হাদীস, ও ইসলামী আইনবিদ আলেমগণের গবেষণালব্ধ এই বক্তব্যগুলো থেকে পণ্য সামগ্রীতে ভেজাল মেশানোর অবস্থান সংক্রান্ত যে নীতিমালা বেরিয়ে আসে সংক্ষেপে বলতে গেলে তা হচ্ছে ঃ-

১। অবৈধ পন্থায় অর্থোপার্জন অবৈধ। হালাল ব্যবসা সম্পদ লেন-দেনের একমাত্র অবলম্বন।

২। অবৈধ পন্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য করা নির্ঘাত আত্মহত্যার শামিল। যা স্পষ্ট হারাম। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ভেজাল প্রবণতা ব্যবসা জগতে ঘোরতর অবৈধ পন্থা।

৩। পণ্যের দোষ লুকানো এবং ভেজালের সংমিশ্রণ ঘটানো হলো স্বতসিদ্ধ প্রতারণা। আর প্রতারণা প্রতারককে মু'মিনদের দলচ্যুত করে যা হারামের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

৪। ইসলামী আইন পণ্যে ভেজাল মিশ্রণকারীকে তার বাণিজ্যিক সমুদয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। লেনদেনের ক্ষেত্রে তার সাথে সামাজিক দূরত্ব সৃষ্টি করে, এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে গোটা সমাজদেহ সংরক্ষণ করতে ইসলাম সরকার প্রধান ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে নির্দেশ প্রদান করে।

৫। যারা ভেজাল মেশানো সহ নানা অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত তারা পাপিষ্ঠ ব্যবসায়ী, অসৎ সওদাগর। কিয়ামতের দিন কঠোর শাস্তি প্রদানের জন্য তাদের জড়ো করা হবে।

তদুপরি যারা খাবারে ভেজাল মেশায় তাদের অপরাধ বহুমাত্রিক। খাবার নষ্ট করা, প্রতারণা করা, হালাল খাবারকে- হারাম উপাদান মিশিয়ে হারাম করা, ব্যবসায় মিথ্যা বলা ইত্যাদি গুরুতর অপরাধে তারা দোষী সাব্যস্ত হয়-।

কোন সন্ত্রাসী যদি কোন নিরপরাধের উপর আঘাত হেনে তার শারীরিক ক্ষতি সাধন করে কিংবা তাকে অক্ষত রেখে তার সম্পদে হস্তক্ষেপ করে তাহলে ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে সেই সন্ত্রাসীর শাস্তি হল, বিপরীত দিক থেকে তার এক হাত ও এক পা কেটে ফেলা, যেন সমাজের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে।

এখন বলা যায়, যে খাদ্যে ভেজাল মেশায় সে উক্ত সন্ত্রাসীর চেয়ে কোন অংশে কম নয়। কেননা সেও বিষাক্ত কেমিক্যাল খাদ্যে মিশিয়ে তা বিশুদ্ধ ও খাঁটি বলে বিক্রি করে। এতে ক্রেতা আর্থিক ও শারীরিক উভয় দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বরং ক্ষেত্র বিশেষে এ ক্ষতি আরো ধ্বংসাত্মক এবং আরো উৎপীড়ক বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণকারীর হাত-পা কেটে দেয়া বা অনুরূপ অন্য কোন কঠিন শাস্তি দেয়া যায় কি-না তা বিবেচনায় আসতে পারে।

আইনী পরামর্শ

পরিবেশ-পরিস্থিতির ভয়াবহতা বিশ্লেষণ পূর্বক স্থান কাল-পাত্র ভেদে যে কোন অন্যায় অপকর্মরোধে বিচারক অপরাধীকে সময়োপযোগী যে কোন লঘু বা গুরু শাস্তি প্রদান করতে পারেন। এমন কি মৃত্যুদণ্ডে পর্যন্ত দণ্ডিত করতে পারেন। দেশের আইন শৃঙ্খলা ও জন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইসলাম এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানায় এবং অকপটে তার বৈধতার স্বীকৃতি প্রদান করে। ইসলামী আইনে একে তথা বিচারকের বিবেচনাধীন ও ইচ্ছাধীন রায়কে 'তা'যীর' বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। *সুতরাং ইসলামী আইন-'তা'যীরের' আলোকে দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতির সাথে যুৎসই উপযোগিতা রক্ষাকারী কতিপয় আইনী পরামর্শ নিম্নে প্রদান করা হলো। সরকার, বিচার বিভাগ ও প্রশাসন বিভাগের নিকট তা বিবেচনার বিশেষ আবেদন থাকল।

১। ভেজাল পণ্য ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে শাস্তি অবস্থাভেদে ৩ বছর জেল থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। আর্থিক জরিমানার পরিমাণ হতে পারে সর্বোচ্চ ৫০ লাখ থেকে কোটি টাকা পর্যন্ত।

২। সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়, সিটি ও পৌর কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ এবং খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণকারী একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন' (বি.এস.টি.আই) কর্তৃক পরিচালিত বর্তমান মোবাইল কোর্টের (ভ্রাম্যমান আদালত) ভেজাল বিরোধী অভিযান স্থায়ী করতে হবে এবং এ অভিযান শুধু রাজধানী ও বন্দর নগরী চট্টগ্রামে সীমাবদ্ধ না রেখে সারা দেশেই চালু করতে হবে। প্রয়োজনে পৌর কর্পোরেশন ও স্বাস্থ্য বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। জানা গেছে, বি.এস.টি.আই-এ-তে নাকি ১৪৫ ধরনের পণ্য পরিদর্শনের জন্য আছেন মাত্র ১২ জন পরিদর্শক। যা প্রয়োজনের তুলনায় ১০ ভাগের এক ভাগও নয়। এ জন্য সংস্থাটির যোগ্য আরো অতিরিক্ত পরিদর্শক নিয়োগ দিয়ে তা সুসংহত করতে হবে।

৩। ভেজাল বিরোধী অভিযানে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীর শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি তাদের মধ্যে নৈতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটাতে হবে। জবাবদিহিতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার দায়িত্ব বোধ তাদের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে। সেই সাথে এদের কেউ ঘুষ, দুর্নীতির আশ্রয় নিলে সেও ভেজাল মেশানোর দায়ে আরোপিত শাস্তির আওতাধীন বলে বিবেচিত হবে।

৪। ভেজাল মেশানো বা কুখাদ্য সরবরাহ করার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি বিক্ষুব্ধ ভোক্তা সাধারণের হাতে ধরা পড়লে এবং তাৎক্ষণিক কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির শিকার হলে সংশ্লিষ্ট ভোক্তাদেরকে হয়রানী করা যাবে না।

৫। প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্যের গায়ে তার উৎপাদন তারিখ ও মেয়াদ কাল উল্লেখ থাকতে হবে।

৬। হোটেল, রেস্তোরাঁ, মিষ্টি, ফাস্টফুডসহ সকল প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত খাদ্য পণ্যের প্যাকেটে বা ভিন্ন কাগজে ঐ পণ্যের মধ্যে কী কী উপাদন ও কেমিক্যাল আছে তার বিবরণ সম্বলিত তালিকা থাকতে হবে। তা চাহিবামাত্র গ্রাহককে দেখাতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকবে।

পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির সাম্প্রতিক চিত্র

নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্য সামগ্রীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে তা ভোক্তা সাধারণের ক্রয়সীমার ভিতরে রাখার ন্যায় সংগত দাবী দীর্ঘদিনের। এ দাবীর প্রেক্ষিতে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু তদারকির ব্যাপারে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন আশ্বাসবাণীও উচ্চারণ করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন পাগলাঘোড়া যেভাবে ছুটে চলেছে তার গতিরোধে করার কোন আন্তরিক উদ্যোগ অদ্যাবধি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। নানা অজুহাতে পণ্যমূল্য দফায় দফায় বেড়ে চলেছে। এই অনিয়ন্ত্রিত ও অস্থিতিশীল এবং আকাশ ছোঁয়া দ্রব্যমূল্যের বাজার ব্যবস্থা, চলমান অর্থনীতির হালচাল, ব্যবসা-বাণিজ্যের চড়াই উৎরাই, বিশেষত চাল, ডাল, নুন, তেল, পিঁয়াজ, রসুন, আদা, গুড়ো দুধ, ডিম, চিনি, ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম যে ভাবে হু হু করে বেড়ে চলেছে সে সম্পর্কে এ যাবতকাল প্রিন্টমিডিয়ায় বহু লেখালেখি হয়েছে ও হচ্ছে। সম্পাদক ও

সংবাদকর্মীরা একই বিষয়ে নানা হেড লাইন দিয়ে পত্রিকার প্রথম ও শেষ পাতায় এবং সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয়তে অবিশ্রান্তভাবে লিখে যাচ্ছেন। তারই অংশ হিসাবে চলতি সাপ্তাহের (২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৫) পণ্য সামগ্রীর বাজার দর সংক্রান্ত প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের কিছু অংশ তুলে ধরলাম। এতে পাঠক মহল দ্রব্যসামগ্রীর বেসামাল উর্ধ্বগতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন।

শব-ই-বরাতের আগের সপ্তাহে ৬০ টাকা দামের আদা ৮০ টাকায় উঠে যায়। শব-ই-বরাতের আগের দিন এই আদার কেজি ১২০ টাকায় গিয়ে দাঁড়ায়। একই অবস্থা পিঁয়াজের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। ২৩/২৪ টাকার পেঁয়াজ এক সপ্তাহ পর ৩০ টাকা পেরিয়ে যায়। এর দু' তিন দিন পর কেজি প্রতি ৩২ থেকে ৩৫ টাকায় পিঁয়াজ বিক্রি হতে শুরু করে। ইতিমধ্যে ৩৬ টাকার চিনি ৪০/৪২ টাকায় সর্বত্র বিক্রি হচ্ছে। গুঁড়ো দুধের কোম্পানিগুলো এক সাপ্তাহের ব্যবধানে কেজি প্রতি ৮/১০ টাকা করে মূল্য বৃদ্ধি করেছে। উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে বুটের ডাল ও ছোলার দাম। রমযানে বুটের ডাল ও ছোলার বাড়তি চাহিদাকে কেন্দ্র করেই এই মূল্য বৃদ্ধি। বুটের ডাল কেজি প্রতি ৩৬ টাকা থেকে বেড়ে ৪৪ টাকা এবং ছোলা ৩৪ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বিক্রি হচ্ছে ৩৬ টাকায়। আর অন্যান্য ডালের দাম বেড়েছে ৫ থেকে ১০ টাকা। কাঁচা বাজারেও মূল্য বৃদ্ধি তুঙ্গে। ২৪ টাকা কেজির বেগুন ২৪-৩০ টাকা এবং ২০ টাকার শসা হয়েছে ২৪ টাকা। ১৫ টাকার ঝিঙা ২০/২৪ টাকা, ১২ টাকার পটল ১৪/১৬ টাকা, ২০/২৪ টাকার করল্লা প্রায় ৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এ ছাড়া ভোজ্য তেল ও মাছ-মাংস এবং চাল, লবণ, আটা সহ নিত্যভোজ্য সকল দ্রব্যাদির দাম উপর্যুপরি বৃদ্ধি লাভ করায় জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে।

ইসলামী আইনে মূল্যবৃদ্ধি ও মজুদদারীর অবস্থান

মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী বাজার হতে সস্তা মূল্যে অধিক পরিমাণে ক্রয় করা এবং তা বিক্রি না করে গুদামজাত করে রাখা, অতপর বাজারে সেই পণ্যের ব্যাপক ঘাটতির সুবাদে যখন তার বিপুল চাহিদা পরিলক্ষিত হয় তখন পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে চড়ামূল্যে পণ্য বাজারজাত করাকে 'ইহ্তেকার' বা মজুদদারী বলে। পণ্য সামগ্রী গুদামজাত করে মজুদদারী নীতি চরিতার্থ করা ব্যবসায়ীদের চিরায়ত নিয়ম ও প্রচলিত রীতি। অন্তরে কোনরূপ কুটিলতা না রেখে বৈধ পন্থায় লাভবান হওয়ার মানসে নিছক ব্যবসায়িক কৌশল হিসেবে যদি মজুদদারী নীতি অবলম্বন করা হয় এবং এর ফলে জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে মজুদদারী ইসলামী আইনে 'মাকরূহে তাহরীমী' চরম নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত কর্ম সাব্যস্ত হবে। আর যদি বাজারে দ্রব্যমূল্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক শোষণ ও অবাঞ্ছিত সম্পদের বিশাল সঞ্চয় গড়ে তোলার স্বার্থে খাদ্য ও পণ্যসামগ্রী মজুদ করা হয় তাহলে তা শরীয়তে নির্ঘাত হারাম ও মহা অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। একটি হাদীসে এসেছে, 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদ্য শস্য মজুদ করতে নিষেধ করেছেন।' অন্যত্র বর্ণিত আছে– 'নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– 'যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন খাদ্য পণ্য মজুদ করে রাখল সে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল এবং আল্লাহ তার উপর থেকে দায়িত্বের হাত সরিয়ে নিবেন। পণ্যের অতিমাত্রায় মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে নবীজী স. বলেছেন, 'মুসলিম জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কেউ যদি পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে অন্যায় হস্তক্ষেপ করে তাহলে আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের উপর বসানোর দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।'

ইমাম ইবনে আবেদীন শামী র. তাঁর জগদ্বিখ্যাত ফতওয়া গ্রন্থ 'রদ্দুল মুহ্তার'-এর পঞ্চম খণ্ডে মজুদদারী বিষয়ক ফতওয়া প্রদান করেছেন এই বলে, মজুদদারীর কারণে দেশে খাদ্য শস্যের অভাবে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সরকার মজুদদার শ্রেণীকে তাদের সমস্ত সম্পদ ন্যায্য মূল্যে বাজারজাত করতে নির্দেশ প্রদান করবে। সরকারের নির্দেশ অগ্রাহ্য করলে সরকার শক্তি প্রয়োগ করে দেশের সকল হাটে-বাজারে সুলভ মূল্যে তাদের গুদামজাতকৃত খাদ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করবে। এমন কি অভাবের কারণে জনগণ নগদমূল্য পরিশোধ করতে অক্ষম হলে তাদের সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত মেয়াদ ধার্য করে বাকীতে খাদ্য হস্তান্তর করবে।'

ফকীহগণের গৃহীত সিদ্ধান্ত

কুরআন, হাদীস ও ইজমা'র আলোকে মজুদদারী ও মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইসলামী ফকীহ্গণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

১। মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে কিনে মজুদ করে চড়া মূল্যের অপেক্ষায় তা বাজারজাত করা থেকে বিরত থাকা সম্পূর্ণ হারাম। তবে নিজের জমির উৎপাদিত ফসল গুদামজাত করা অনুরূপভাবে পরিবারের বাৎসরিক ব্যয় ভার বহনের প্রয়োজনীয় পরিমাণ পণ্য মজুদ করে রাখা বৈধ।

২। অতিরিক্ত মৌসুমী উৎপাদন অন্য মৌসুমে সহজলভ্য করার কিংবা ভবিষ্যতের সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার উদ্দেশ্যে সরকার প্রয়োজনীয় পরিমাণ পণ্য সামগ্রী মজুদ করতে পারবে।

৩। স্বাভাবিক অবস্থায় সরকারের পক্ষ হতে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দেয়া অসমীচীন। এ ব্যাপারটি ব্যবসায়ী ও ভোক্তা শ্রেণীর ইচ্ছাধিকারের উপর ছেড়ে দেয়া ন্যায় সংগত ও যুক্তিযুক্ত। তবে ব্যবসায়ী মহল যদি স্বেচ্ছাচারী হয়, মাত্রাতিরিক্ত চড়া মূল্যে পণ্য বিক্রি করে ভোক্তাসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা ও বঞ্চনা বিড়ম্বনার পরিবেশ সৃষ্টি করে তাহলে জনগণকে অর্থনৈতিক বাহুল্য চাপ থেকে মুক্ত করতে এবং তাদের ন্যায় অধিকার ন্যায়-সংগত ভাবে সংরক্ষণ করতে সরকার বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শক্রমে দ্রব্য মূল্য নির্ধারণ করে দিবে এবং ব্যবসায়ী মহলকে তা পালনে বাধ্য করবে।

৪। সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করে ব্যবসায়ীচক্র যদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত দামে পণ্য বাজারজাত করে কিংবা নিয়মবহির্ভূত ভাবে পণ্য গুদামজাত করে রাখে এবং এর ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ বা বাজার ব্যবস্থার অস্থিতিশীলতায় জনগণ অবর্ণনীয় নিগ্রহ ও দুর্ভোগের

শিকার হয় তাহলে সরকার অপরাধীদের গ্রেফতার করতে পারবে এবং তাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত মালামাল ন্যায্যমূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে হস্তগত করে তা জনগণের জন্য বাজারে ছেড়ে দেবার পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হবে।

ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ

বাংলাদেশ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল। প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমান। এ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মানুসারী গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানরাই পরিচিত। সুতরাং এ দেশের ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যেও মুসলমান ব্যবসায়ীর সংখ্যাই বেশি। কিন্তু তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড ও নীতিমালা প্রত্যক্ষ করলে এমনটি মনে হয় না। যারা আল্লাহকে রব হিসেবে মনে প্রাণে গ্রহণ করে, শেষ বিচারের দিন আল্লাহর কাঠগড়ায় জবাবদিহিতার ভয়াবহ অনুভূতি যাদের অন্তরে স্পন্দন জাগায় তারা কীভাবে কোন সুবাদে ভেজাল ও মজুদদারীর মত জঘণ্য প্রবণতায় মেতে ওঠে। তা মোটেই বোধগম্য নয়। তারা কি জানে না মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অমর বাণী- 'সত্যবাদী বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে হাশরের দিন উত্থিত হবে।' দোষ গোপন করে পণ্য বিক্রেতাকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন- এ কথাও তাদের জানা থাকার কথা। তাহলে ব্যবসায়ে সততার পরিচয় দিতে তারা উদ্যমী হয়না কেন? 'নিজের জন্য যা পছন্দনীয় অন্যের জন্য তা পছন্দ করা পরিপূর্ণ মু'মীন হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত'। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই চিরন্তন মর্মবাণী মুসলমান হিসেবে তাদেরও বোধ করি অজানা নয়।

প্রতারণামূলক ব্যবসা করে উপার্জিত সম্পদ ভোগ করা হারাম। কেননা তাতে অন্যের অবৈধ সম্পদের সংমিশ্রণ থাকে, যা ধোকার আশ্রয় নিয়ে হস্তগত করা হয়। আর আল্লাহ তার প্রিয় নবীগণকেও হালাল খাদ্য আহার করতে আদেশ করেছেন।- 'হে রসূলগণ! তোমরা হালাল ও পবিত্র খাদ্যবস্তু ভক্ষণ কর এবং নেক কাজ কর।' সূরা মুমীনুন ঃ রুকু-৪। একই প্রসঙ্গে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'হালাল খাদ্য ভক্ষণ ইবাদাত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত'। সরকারী আদেশ নিষেধ, দেশীয় আইন-শৃংখলা ও ব্যবসানীতি থেকে সরে গিয়ে বরাবরই স্বেচ্ছাচারিতায় মেতে উঠছে ব্যবসায়ী মহল। সুতরাং এ মুহূর্তেও যদি তারা উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসের আলোকে তাদের ব্যবসানীতিটা 'শুদ্ধ' করে নিত এবং ইসলাম যে মানবতা, উন্নত নৈতিকতা, মানবিক দায়বদ্ধতা, অপরের কল্যাণকামনা এবং পারস্পরিক সহানুভূতি ও সমবেদনার সমুজ্জ্বল আলোকিত দিগন্ত উপহার দিয়েছে তার আলোয় নিজেদের ভাস্বর করে তুলত, তাহলে হয়ত দেশটা সন্ত্রাস, ধোকা ও প্রতারণার অনলে পুড়ে দগ্ধ হত না।

পূর্বযুগের মুসলমানরা ক্রয়-বিক্রয়ে পণ্যের দোষ থাকলে তা অকপটে বলে দিতেন। গোপন করতেন না। এ ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে সত্যকে প্রাধান্য দিতেন। কেননা, তারা মানুষের কল্যাণ কামনা করতেন। কাউকে ধোকা দিয়ে ক্ষতি সাধন করতেন না কস্মিন কালেও। প্রখ্যাত

ফিকাহবিদ ইবনে সিরীন বাজারে একটি ছাগী বিক্রির সময় ক্রেতাকে বললেন, এই ছাগীর মধ্যে একটা দোষ রয়েছে। আমি তোমার সামনে তা প্রকাশ করে দায়মুক্ত হতে চাই। ছাগীটি ঘাস খাওয়ার সময় পায়ের সাহায্যে ঘাস এদিক সেদিক ছড়ায়-ছিটায়। হাসান ইবনে সালেহ র. একটি ক্রীতদাসী বিক্রির সময় ক্রেতাকে বললেন, একদিন ওর মুখ থেকে থুথুর সাথে রক্ত বেরিয়েছিল। এ যুগে যারা পণ্যে ভেজাল মেশায় তারা যদি এই ঘটনাদ্বয়ের মাপকাঠিতে নিজেদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের পরিমাপ করতো, তাহলে হয়ত তাদের অবাধ নীতিহীনতা ও অপরাধ-প্রবণতা আংশিক হলেও হ্রাস পেত।

ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায়, হযরত ওমর রা.-এর খেলাফত কাল। তখন মদীনায় চরম দুর্ভিক্ষ। মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু নির্বিশেষে অনাহারে-অর্ধাহারে এবং ক্ষুধায় পিপাসায় মুমূর্ষ-কাতর ও মৃত্যুমুখী। তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তখন এক শুভ সকালে মদীনাবাসীর ভাগ্যাকাশে সোনালী সূর্যের উদয় ঘটল। সুদূর সিরিয়া থেকে খাদ্যদ্রব্য বোঝাই এক বিশাল উটের বহর মদীনার উপকণ্ঠে এলো। শত শত মনের এই অঢেল খাদ্য শস্য অন্যকারো নয়; সাহাবী হযরত উসমান রা. এর আমদানীকৃত ব্যবসায়িক পণ্য। উসমান রা.-এর সামনে এখন সুবর্ণ সুযোগ। গোটা শহরে খাদ্যের হাহাকার। স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে দ্বিগুণ-তিনগুণ চড়া মূল্য হাঁকিয়ে তিনি নিমিষেই কোটি টাকার মালিক বনতে পারেন এই মুহূর্তে। এমন একটি নিশ্চিত সম্ভাবনা তার সৌভাগ্যদ্বারে কড়া নাড়ছে। এ দিকে মুনাফা লোভী ক্ষুদে ব্যবসায়ীরা উসমান রা. এর ঘরের সামনে জড়ো হয়েছে। পাইকারী দরে মাল কিনতে তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। এখন উসমানের সম্মতির অপেক্ষায় মুখ চেয়ে আছে। সহসা উসমান রা. তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে কোনরূপ রাখঢাক ছাড়াই বলে উঠলেন, মুসলমানদের এই কঠিন দুর্দিনে তোমরা আমাকে চড়া মূল্যে ব্যবসা করতে পীড়াপীড়ি করছ? তাহলে শোন,' আমার সদ্য আমদানীকৃত সমুদয় খাদ্যশস্য দুর্ভোগের শিকার গোটা মদীনা বাসীকে বিনামূল্যে দান করলাম। অতঃপর মদীনার ঘরে ঘরে তিনি তার অসামান্য ত্রাণ ভাণ্ডার সুনিপূনভাবে বিতরণ করলেন। গরীবের মুখে খাবার তুলে দিয়ে এবং অভাবীর মুখে হাসি ফুটিয়ে উসমানের চোখ থেকে আনন্দাশ্রু ঝরল এবং মুখ থেকে কৃতজ্ঞতার ধ্বনী উচ্চারিত হল। দেহমন তার পুলকিত হল। পরদিন হযরত ইবনে আব্বাস রা. স্বপ্নযোগে অবলোকন করলেন এক অভাবনীয় দৃশ্য। দারুন চমৎকার সে দৃশ্য। দেখলেন, চোখ ঝলসানো বাহারি রঙের অতিমূল্যবান জান্নাতী সুগন্ধযুক্ত পোশাক পরিধান করে প্রধান অতিথিবেশে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথায় যেন যাচ্ছেন। একটি দ্রুতগামী তেজি ঘোড়া তাকে বহন করে উল্কা বেগে ছুটে চলেছে। ইবনে আব্বাস রা. তাঁকে তড়িঘড়ি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এত জাঁকজমকভাবে কোথায় যাচ্ছেন? তিনি উত্তর করলেন, গত কাল মদীনাবাসীর প্রতি উসমানের নিঃস্বার্থ অনুদানে আল্লাহ বেজায় খুশী হয়েছেন। তাকে ক্ষমা করেছেন এবং তার সম্মানে জান্নাতে এক অনিন্দ্য সুন্দরী রূপসী হুরের সাথে তার শুভ বিবাহ উপলক্ষে এক আড়ম্বর পূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। আমি সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছি।

ছোট্ট অথচ তাৎপর্যপূর্ণ এই ঘটনাটি মুনাফালোভী মুসলমান ব্যবসায়ী ভাইদেরকে অন্তরচক্ষু দিয়ে ক্ষণিকের জন্য অবলোকন করতে অনুরোধ করব। পূণ্যের মাস, রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের মাস রমযানে যারা চড়া মূল্যে ব্যবসা করে রোযাদার মুসল্লিদেরকে বিব্রত করে, তাদেরকে অনুরোধ করব তারা যেন তাদের ব্যবসানীতি উসমান রা. এর ব্যবসানীতির সাথে একটু তুলনা করেন। এবং নিজেদের একটু তলিয়ে দেখেন। দু'চোখ বন্ধ করে একটু যেন ভাবেন- 'হাশরের দিন রসূলের কাছে তাদেরও ধর্না দিতে হবে শাফায়াত লাভের আশায়। সে দিন রসূল যদি প্রশ্ন করেন- 'তুচ্ছ দুনিয়া লাভ করতে আমার এতগুলো সরলমনা উম্মতকে পণ্যে ভেজাল দিয়ে এবং মূল্য বৃদ্ধি করে অসহনীয় দুর্ভোগে ফেলেছিলে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর যেন আত্মস্থ করেই তারা পরপারে পাড়ি জমান। এ কথাগুলো তাদের অন্তরে দাগ কাটলে, সামান্য আবেদন সৃষ্টি করলে, তাদের ঘুমন্ত মানবিক সত্তায় জাগরণ সৃষ্টি করলে আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে।

●

'মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১'-এ পৌত্র-পৌত্রী এবং দৌহিত্র-দৌহিত্রীর

উত্তরাধিকার ঃ ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক একটি পর্যালোচনা

ড. মনজুর-ই-ইলাহী

১৯৬১ সনে সাবেক পাকিস্তানে আইয়ুব খানের সামরিক সরকার তৎকালীন নেতৃস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম ও ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণের প্রবল বাধা সত্ত্বেও 'মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ-১৯৬১' জারি করেন। উক্ত অধ্যাদেশ বাংলাদেশে এখনও হুবহু চালু ও কার্যকর আছে। উক্ত অধ্যাদেশের ধারা ৪-এ পৌত্র/দৌহিত্রের উত্তরাধিকার (Succession) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

'যার সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে বণ্টিত হবে, তার পূর্বে তার কোন পুত্র বা কন্যা মারা গেলে এবং উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি বন্টনের সময় উক্ত পুত্র বা কন্যার কোন সন্তানাদি থাকলে তারা প্রতিনিধিত্বের হারে সম্পত্তির ঐ অংশ পাবে, যা তাদের পিতা অথবা মাতা জীবিত থাকলে পেতো।'

এ ধারাটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ঃ

১. দাদার পূর্বে বাবা মারা গেলে পৌত্র-পৌত্রী সর্বাবস্থায় দাদার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি থেকে বাবা জীবিত থাকলে যতটুকু পেত, ততটুকু পাবে।

২. দাদীর পূর্বে বাবা মারা গেলে পৌত্র-পৌত্রী সর্বাবস্থায় দাদীর মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি থেকে বাবা জীবিত থাকলে যতটুকু পেত, ততটুকু পাবে।

৩. নানার পূর্বে মা মারা গেলে দৌহিত্র-দৌহিত্রী সর্বাবস্থায় নানার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি থেকে মা জীবিত থাকলে যতটুকু পেত, ততটুকু পাবে।

৪. নানীর পূর্বে মা মারা গেলে দৌহিত্র- দৌহিত্রী সর্বাবস্থায় নানীর মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি থেকে মা জীবিত থাকলে যতটুকু পেত, ততটুকু পাবে।

অধ্যাদেশের এ ধারাটিতে অনেক দিক থেকেই ইসলামী উত্তরাধিকার নীতিমালা সুস্পষ্টভাবে লংঘন করা হয়েছে। এদিকগুলো আমরা একে একে উল্লেখ করছি।

(১) দাদা-দাদীর পূর্বে বাবা মারা গেলে, যদি দাদা-দাদীর মৃত্যুর সময় এক বা একাধিক চাচা (অর্থাৎ দাদা-দাদীর কোন পুত্র) বর্তমান থাকে, তাহলে ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী পৌত্র ও

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্ট্যাডিজ বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

পৌত্রীর কেউই দাদা কিংবা দাদীর সম্পত্তি থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে মিরাস পাবে না। অথচ উপরোক্ত অধ্যাদেশটিতে সর্বাবস্থায় দাদা-দাদীর সম্পত্তি থেকে পৌত্র-পৌত্রী মৃত বাবার প্রতিনিধিত্বের হারে সম্পত্তি পাবে বলে উল্লেখ আছে। ইসলামী শরীয়তের সাথে অধ্যাদেশটি এ ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক।

কেননা শরীয়তের নিয়ম হল ঃ অধস্তনের প্রত্যেক পুরুষ তার চেয়ে অধিক নিম্নস্তরের নারী-পুরুষ সকলকে মিরাস থেকে বঞ্চিত করবে।[১]

এ নিয়মের পক্ষে ইমাম বুখারী মীরাস অধ্যায়ে ইবনে সাবিত থেকে একটি উক্তি বর্ণনা করেন এবং ইবনে আব্বাস (রা) থেকে একটি হাদীস উল্লেখ করেন।[২]

ইবনে সাবিত বলেন, অর্থাৎ পুত্রের সন্তানগণ নিজের সন্তানের সমতুল্য, যখন তাদের অধস্তন কোন পুত্রসন্তান না থাকে। পুত্রের ছেলে সন্তানগণ পুত্রেরই মত এবং মেয়ে সন্তানগণ মেয়েরই মত। আপন সন্তানের মতই তারা ওয়ারিস হয় এবং ওদের মতই তারাও কোন কোন ওয়ারিসকে বাধাগ্রস্ত করে। আর পুত্রের উপস্থিতিতে তার সন্তানগণ মিরাস পাবে না। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যারা ফারায়েয তথা মিরাসের সুনির্দিষ্ট অংশের অধিকারী তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও। আর যা বাকী থাকবে, তা দেয়া হবে সম্পর্কের দিক থেকে মৃতের নিকটতর পুরুষকে।[৩]

এ হাদীসটিতে নির্দিষ্ট অংশ দেয়ার পর বাকী অংশ 'আসাবা'দেরকে দেয়ার কথা বলা হয়েছে মৃতের নিকটতর হওয়ার ভিত্তিতে। কেননা 'আসাবা'দের একের উপস্থিতি অন্যকে মিরাস থেকে মাহরুম ও বঞ্চিত করে। আর তা নির্ণীত হয় নিকটতর হওয়ার ভিত্তিতে। উল্লেখ্য, এখানে 'পুরুষ' কথাটি বলা হলেও মহিলা আসাবাগণও একই হুকুমের অন্তর্ভূক্ত হবেন।[৪]

এছাড়া কুরআনে কারীমে পুত্র-সন্তানের উত্তরাধিকারসত্ত্বের ঘোষণা দেয়া হলেও সরাসরি পুত্রের সন্তান তথা পৌত্রের কথা বলা হয়নি। তবে আলেমদের ইজমা' তথা সর্বসম্মত মত হল, দাদার কোন পুত্র জীবিত না থাকলে পুত্রের পুত্র সন্তানগণ তার স্থলাভিষিক্ত হবে।[৫]

কেননা শরীয়তের পরিভাষায় সন্তানের সন্তানগণও সন্তানরূপে গণ্য হয়। আর এমতাবস্থায় পুত্রের কন্যাগণও তাদের ভ্রাতাদের সাথে আসাবা হিসাবে মিরাস পাবে।

উপরোক্ত দলিলগুলোর সারকথা হলো, দাদা/দাদীর কোন পুত্রসন্তান জীবিত থাকলে পুত্রের অধস্তন যে কোন সন্তান (পৌত্র/পৌত্রী) তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে।

(২) আর যদি দাদা/দাদীর শুধু কন্যা সন্তানগণই জীবিত থাকে এবং তাদের পূর্বে মারা যাওয়া তাদের মৃত পুত্রদের ছেলেমেয়েরা জীবিত থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় কন্যাদের নির্দিষ্ট অংশ দেয়ার পর বাকী অংশ পৌত্র/পৌত্রী আসাবা হিসাবে পাবে। এক্ষেত্রেও উপরোক্ত অধ্যাদেশটি শরীয়ত বিরোধী। কেননা অধ্যাদেশ অনুযায়ী পৌত্র/পৌত্রীরা মৃত বাবার প্রতিনিধিত্বের হারে অংশ পাবে, যা উপরোক্ত অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

(৩) যদি দাদা/দাদীর একটি মাত্র কন্যা থাকে এবং মৃত পুত্রের এক বা একাধিক কন্যা থাকে, তাহলে মৃত পুত্রের কন্যা/কন্যাগণ ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। কেননা মেয়েদের জন্য নির্ধারিত দুই তৃতীয়াংশের অর্ধেক কন্যা নেয়ার পরও এক ষষ্ঠাংশ বাকী থাকে, যা শরীয়ত পুত্র না থাকায় পৌত্র/পৌত্রীদের জন্য নির্ধারণ করেছে। কিন্তু উপরোক্ত অধ্যাদেশে পৌত্র/পৌত্রীদেরকে দেয়া হয়েছে মৃত বাবার অংশ, যা ইসলামী শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক।

(৪) যদি দাদা/দাদীর একাধিক কন্যা বর্তমান থাকে এবং মৃত পুত্রের এক বা একাধিক কন্যা থাকে, এমতাবস্থায় পুত্রের কন্যাগণ কিছুই পাবে না। কেননা মেয়েদের জন্য নির্ধারিত দুই তৃতীয়াংশ কন্যাগণ নেয়ার মাধ্যমে শেষ হয়ে গিয়েছে। এ অবস্থায়ও উপরোক্ত অধ্যাদেশটি ইসলামী শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ, কন্যাদের এ অবস্থায় তাদের মৃত বাবার অংশ পাওয়া শরীয়তের ফয়সালা নয়, অথচ অধ্যাদেশটিতে তাই বলা হয়েছে।

(৫) ইসলামী শরীয়তে আসাবা ও আসহাবুল ফুরূদের উপস্থিতিতে দৌহিত্র-দৌহিত্রী কখনোই নানা-নানীর সম্পত্তির ওয়ারিস হবে না। কেননা আল-কুরআন ও আস-সুন্নায় তাদেরকে কোন মিরাস দেয়া হয়নি। অথচ উপরোক্ত অধ্যাদেশটিতে নানা-নানীর আগে মায়ের মৃত্যু হলে দৌহিত্র -দৌহিত্রীকে মায়ের প্রতিনিধিত্বের হারে সম্পত্তি দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

শরীয়তের পরিভাষায় কন্যার সন্তানদেরকে বলা হয় 'যাবিল আরহাম' অর্থাৎ এমন আত্মীয় যারা 'আসহাবুল ফুরূদ্' (নির্দিষ্ট অংশের অধিকারী) কিংবা 'আসাবা' নয়। এরকম আত্মীয়দের মধ্যে আরো রয়েছে বোনের সন্তানগণ, ভাইয়ের কন্যাগণ, মামা ও খালা প্রভৃতি। এরা 'আসহাবুল ফুরূদ' ও 'আসাবা' থাকাবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে উত্তরাধিকার সত্ত্ব পাবে না।[৬]

সৌদী আরবস্থ্ ইফতা ও ইলমী গবেষণার স্থায়ী কমিটিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল : "নানার জীবদ্দশায় মায়ের মৃত্যু হলে মায়ের পুত্রগণ কি নানার সম্পত্তি থেকে মিরাস পাবে? মিরাস পেলে তার পরিমাণ কতটুকু? উল্লেখ্য যে, নানার মৃত্যুর সময় এদের দুই মামা, তিন খালা ও নানী জীবিত ছিল"। এ ব্যাপারে কমিটির লিখিত উত্তর ছিল ঃ 'ব্যাপার যদি তেমনটিই হয়ে থাকে যেরূপ উল্লেখ করা হয়েছে, তাহলে এ পুত্রগণ নানার সম্পত্তি থেকে কিছুই পাবে না। কেননা তারা হল 'যাবিল আরহাম' এর অন্তর্ভুক্ত, যারা স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্যান্য 'আসহাবুল ফুরূদ' ও 'আসাবা'র উপস্থিতিতে কোন সম্পত্তির ওয়ারিস হয় না'।[৭]

অবশ্য যদি 'আসহাবুল ফুরূদ' ও 'আসাবা' না থাকে, তাহলে অধিকাংশ আলেম যাবিল আরহামকে উত্তরাধিকার দেয়ার কথা বলেছেন।

লক্ষণীয়, দৌহিত্র/দৌহিত্রী উভয়ের ক্ষেত্রে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের উত্তরাধিকার ধারাটি সাংঘর্ষিক। কেননা উপরোল্লেখিত কোন অবস্থাতেই ইসলামী শরীয়ত তাদের বাবা/মায়ের প্রতিনিধিত্বের হারে নানা/নানী থেকে মিরাস পাওয়ার বিধানকে সমর্থন করে না।

আমাদের করণীয় ঃ

অতএব মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ-১৯৬১ এর উপরোক্ত ধারাটি যেহেতু ইসলামী আইন ও বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক, তাই এ ধারাকে এমনভাবে সংশোধন করা প্রয়োজন যাতে ইসলামী আইনের সাথে এর কোন সংঘর্ষ না থাকে এবং ইসলামী শরীয়তের বিধিমালা অনুযায়ী এ ধারাটির পুনর্বিন্যাস করা হয়।

আমরা মনে করি ইসলামী শরীয়তে সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) অসিয়তের যে বিধান রয়েছে, আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে যদি তা বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে শরীয়ত সমর্থিত পন্থায় পৌত্র-পৌত্রী এবং দৌহিত্র-দৌহিত্রীদেরকে সম্পত্তি দেয়া যায় এবং আইনের এ অধ্যাদেশটিকে আমরা শরীয়তের বিরোধিতা থেকে মুক্ত করতে পারি।

উল্লেখ্য, ওয়াজিব তথা বাধ্যতামূলক এ অসিয়তের বিধানটি বেশ কয়েকটি মুসলিম দেশে প্রচলিত রয়েছে। তন্মধ্যে মিসর, মরক্কো, সিরিয়া, কুয়েত ও লেবানন অন্যতম।[৮] সামান্য কিছু পার্থক্য থাকলেও এ আইনের মাধ্যমেই এসব দেশে দাদা-দাদীর সম্পত্তি থেকে পৌত্র-পৌত্রীকে নিয়মানুযায়ী একটা অংশ দেয়া হয়।

সংশোধনসহ প্রস্তাবনা ঃ

ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) অসিয়তের বিধান বাস্তবায়ন করে আমরা অধ্যাদেশের ৪নং ধারাটিকে সংশোধিত করে এভাবে বিন্যস্ত করতে পারি ঃ-

যার সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে বণ্টিত হবে, তার পূর্বে তার কোন পুত্র বা কন্যা নিজেদের কোন সন্তান রেখে মারা গেলে উক্ত সম্পত্তির অধিকারী তার জীবদ্দশায় মারা যাওয়া পুত্রের বা কন্যার সন্তানদের জন্য অসিয়ত করবেন, যেন তার মৃত্যুর পর এ সম্পত্তি থেকে তাদেরকে নিয়মানুযায়ী[৯] একটা অংশ প্রদান করা হয়। তবে উল্লেখ্য যে, কোন অবস্থাতেই তা এক তৃতীয়াংশের বেশি হবে না'। ওয়াজিব অসিয়তের এ বিধানটি ইসলামী শরীয়তের মাপকাঠিতে কতটা উত্তীর্ণ নিচে আমরা সে বিষয়টি তুলে ধরছি।

ওয়াজিব অসিয়ত কি?

আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যারা আদৌ ওয়ারিস নয় কিংবা ওয়ারিস হওয়া সত্ত্বেও শরীয়তের কোন বাধার কারণে মিরাস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তাদেরকে আল-কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক সম্পত্তি থেকে নিয়ম মাফিক অংশ প্রদানের জন্য মৃত্যুর পূর্বে যে অসিয়তের বিধান দেয়া হয়েছে, তাই হল ওয়াজিব তথা বাধ্যতামূলক অসিয়ত।

দলিল ঃ আল-কুরআনের নিম্নোক্ত বাণী ওয়াজিব অসিয়তের দলিল ঃ

তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যায়, তবে তার জন্য অসিয়ত করা বাধ্যতামূলক করা হলো, পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের জন্য,

বিধিসম্মতভাবে। আল্লাহভীরুদের জন্য এ নির্দেশ অবশ্যম্ভাবী। যদি কেউ অসিয়ত শোনার পর তাতে কোন রকম পরিবর্তন সাধন করে, তবে যারা পরিবর্তন করে তাদের উপর এর পাপ পতিত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন।' [সূরা আল-বাকারাহ ঃ ১৮০]

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ঃ

এর মর্ম হলো, 'হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর ফরয ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে' যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে অর্থাৎ তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে।

অর্থাৎ যদি সম্পদ রেখে যায়। সুতরাং এখানে 'খাইর' অর্থ হলো সম্পদ, চাই তা স্থাবর কিংবা অস্থাবর হোক কিংবা অর্থসম্পদই হোক।

শব্দটির মর্মকথা হলো, ওয়ারিসদের প্রতি জুলুম না করে। সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশকে হাদীসে অসিয়তের সর্বোচ্চ নেসাব বলা হয়েছে।[১০]

তাই এক তৃতীয়াংশ বা এর কম পরিমাণ অসিয়ত করলে ওয়ারিসগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না বলেই সাব্যস্ত হয়েছে।

অর্থাৎ মুত্তাকীদের জন্য এটা পালন করা জরুরি। এ কথা দ্বারা অসিয়ত ওয়াজিব হবার ব্যাপারটি আরো জোরদার হয়েছে।[১১]

বহুসংখ্যক আলেম এ মত প্রকাশ করেন যে, আয়াতটি মুহকাম (অর্থাৎ এর হুকুম এখনও বহাল) এবং এর বাহ্যিক অর্থ যদিও ওয়ারিস ও ওয়ারিস নয়, এমন সকল পিতা-মাতা ও আত্মীয়কে শামিল করে, তবু এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল খাস, অর্থাৎ ওয়ারিস নয় এমন পিতা-মাতা (যেমন কাফের পিতা-মাতা) এবং ওয়ারিস নয় এমন আত্মীয়কে (যেমন দাদার পুত্র থাকাবস্থায় নাতিকে) সম্পত্তির অংশ দেয়ার অসিয়ত করা। কেননা আল্লাহ কুরআনে যাদের জন্য মিরাস সাব্যস্ত করেছেন, তাদেরকে দ্বিতীয়বার দেয়ার বিধান নেই।[১২]

এ বিষয়টি তুলে ধরতে গিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অর্থাৎ আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করেছেন। সুতরাং ওয়ারিসের জন্য কোন অসিয়ত করা যাবে না।[১৩]

এমতের প্রবক্তাদের মূল কথা হলো, ইসলামী শরীয়তে যাদের জন্য কোন মিরাস দেয়া হয়নি বা শরয়ী' কোন বাধার কারণে যারা মিরাস থেকে বঞ্চিত আছেন, তাদের ক্ষেত্রে অসিয়ত ওয়াজিব হবার বিধানটি প্রযোজ্য হবে।

এ মতটি যারা পোষণ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা, হাসান বসরী, মসরূক, ত্বাউস, ইয়ায, সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব, মুসলিম ইবনে ইয়াসার, ক্বাতাদাহ, ইবনে জারীর, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহে র. প্রমুখ পণ্ডিতগণ।[১৪]

এটি ইমাম আহমদেরও একটি মত[১৫] এবং ইমাম শাফেয়ীর প্রথম মত।[১৬]

ইবনে আব্বাস রা, হাসান ও ক্বাতাদাহ বলেন, 'আয়াতটি আ'ম (ব্যাপকার্থক)। নির্দিষ্ট একটি সময়

পর্যন্ত এ ব্যাপকার্থ অনুযায়ী আমল করা হত। মিরাসের আয়াতের মাধ্যমে যাদেরকে ওয়ারিস সাব্যস্ত করা হলো, শুধু তাদের ব্যাপারেই অসিয়তের আয়াতটি আংশিকভাবে মানসুখ হয়েছে।[১৭] একথার অর্থ হল, যারা ওয়ারিস হয়নি তাদের ব্যাপারে আয়াতটি মুহকাম (বহাল)[১৮] দাহহাক, ত্বাউস অনুরূপ মত প্রকাশ করেন এবং ইমাম ত্বাবারী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এ মতটি সমর্থন করেন।[১৯]

ইমাম যুহরী বলেন, 'কম হোক বেশি হোক, অসিয়ত ওয়াজিব।' [২০]

ইবনে আব্বাস ও হাসান বলেন, অর্থাৎ 'সূরা নিসার নির্ধারিত মিরাসের আয়াত দ্বারা পিতা-মাতার জন্য অসিয়ত রহিত হলেও অন্য যারা ওয়ারিস হয়নি তাদের ক্ষেত্রে বিধানটি বহাল রয়েছে। এটাই ইমাম শাফেয়ী ও অধিকাংশ মালেকীদের মাযহাব এবং একদল আলেমের অভিমত।' [২১]

ইমাম ত্বাবারী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বলেন, 'একদল আলেম বলেছেন, অসিয়তের আয়াতটি মিরাসের আয়াত দ্বারা মানসুখ হয়ে গিয়েছে। এর উত্তরে বলা হবে, আরেকদল আলেমের মতে মিরাসের আয়াত দ্বারা এ আয়াতটি রহিত হয়নি, বরং এটি মুহকাম। এ আয়াতের রহিত হওয়া নিয়ে যখন দু'দল আলেমের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে, তখন দলিল ছাড়া একথা মানা যাবে না যে, এটি মানসুখ। বরং দেখা যায়, একই সময়ে সহীহভাবে কোন একটির হুকুমকে বাদ দিয়ে আয়াতদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান অসম্ভব নয়। অথচ একটি রহিতকারী ও অপরটি রহিত সাব্যস্ত করলে একই সময়ে সহীহভাবে এতদুভয়ের হুকুম প্রয়োগে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভবপর হবে না।' [২২]

আয়াতদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে তিনি বলেন, অর্থাৎ 'এ আয়াতটির হুকুমের ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ আয়াতটির কোন হুকুমই রহিত করেননি। বরং বাহ্যিকভাবে এটি ব্যাপকার্থক যা প্রত্যেক পিতা-মাতা ও আত্মীয়কে শামিল করে। কিন্তু মৃতের সম্পত্তি থেকে মিরাস পায় না এ ধরনের আত্মীয়ই এখানে উদ্দেশ্য।' [২৩]

সাইয়েদ কুতুব তার 'ফি যিলালিল কুরআন' গ্রন্থে ওয়ারিস নয় এমন আত্মীয়ের ক্ষেত্রে অসিয়তের এ আয়াতটি রহিত নয়, বরং এর বিধান এখনো বাকী আছে, এ মতের প্রতি তার সমর্থনের কথা উল্লেখ করেন।[২৪]

আয়াতটি মানসুখ নয়, বরং মুহকাম, এ মতের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করে 'আল-মানার' তাফসীর গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

অর্থাৎ এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নেই যে, অসিয়তের আয়াতটির পরে এখানে মিরাসের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতের 'সিয়াক' (পূর্বাপর বাকরীতি) মানসুখ হওয়াকে সমর্থন করে না। কেননা আল্লাহ যখন মানুষের জন্য কোন বিধান প্রণয়ন করেন এবং জানেন যে, তা একটি সাময়িক বিধান এবং অচিরেই অল্প কিছুকাল পরে তা রহিত করবেন, তখন তাকীদ দিয়ে সে বিধানকে শক্তিশালী করেন না। অথচ অসিয়তের বিষয়টিকে এখানে তাকীদ করা হয়েছে 'মুত্তাকীদের জন্য ওয়াজিব ' এবং 'যে তা পরিবর্তন করবে, তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে' এ কথা বলে। তদুপরি

আয়াতদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব, যদি আমরা বলি যে, অসিয়তের আয়াতে উল্লেখিত অসিয়ত ওয়ারিস নয় এমন আত্মীয়ের সাথে খাস। যেমন আত্মীয় দ্বারা সে বিশেষ আত্মীয় বুঝানো উদ্দেশ্য, যিনি অন্য ধর্মের অনুসারী হওয়ার কারণে মিরাস থেকে বঞ্চিত থাকেন। অতএব যদি কোন কাফের ইসলাম গ্রহণ করার পর তার মৃত্যু কালে তার বাবা-মা উপস্থিত থাকেন, তাহলে তাদের জন্য এ পরিমাণ অসিয়ত করা যেতে পারে যা তাদের হৃদয়কে আকর্ষণ করে। কেননা কাফের হলেও আল্লাহ বাবা-মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করেছেন।'[২৫]

যারা আয়াতটিকে মানসুখ বলেছেন, ইমাম ইবনে হাযম তাদের দাবী অপনোদনে 'তার 'আল-মুহাল্লা' গ্রন্থে বলেন,

অর্থাৎ 'আমরা নিশ্চিতরূপে জানি এবং সাক্ষ্য দেই যে, আমাদের কাছে কোন বর্ণনা আসা ব্যতিরেকে কোন কিছুকে রহিতকারী সাব্যস্ত করা এবং কোন বিধানকে মানসুখ হিসাবে ফিরিয়ে দেয়ার কোন পথ নেই।'[২৬]

তিনি আরো বলেন,

অর্থাৎ 'প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয হল, দাসত্বের বন্ধনে থাকার কারণে কিংবা কুফ্‌রীর কারণে অথবা মিরাস থেকে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে বা প্রকৃতই ওয়ারিস না হওয়ার কারণে যে সকল আত্মীয় স্বজন উত্তরাধিকার সত্ত্ব পাবে না, তাদের জন্য অসিয়ত করা.....।'[২৭]

এ প্রসঙ্গে ইবনে উমর (রা) থেকে ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদিসটিকেও অনেকে দলিল হিসাবে পেশ করেছেন।[২৮]

হাদীসটি হল, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অর্থাৎ কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য এটা সমীচীন নয় নিজের কাছে অসিয়ত লিপিবদ্ধ না করে দুই বা (কোন কোন বর্ণনায়) তিন রাত্র সে অতিবাহিত করবে।[২৯]

উল্লেখ্য, আলেমদের মধ্যে অনেকে আবার এ মতও পোষণ করেন যে, পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের জন্য অসিয়ত ওয়াজিব হওয়ার আয়াতটি সম্পূর্ণভাবে রহিত ও মানসুখ হয়ে গিয়েছে। তাফসীর আল-মানার গ্রন্থে বলা হয়েছে, অধিকাংশ আলেম মনে করেন যে, অসিয়তের আয়াতটি মিরাসের আয়াত দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। কেউ কেউ বলেন, 'ওয়ারিসদের জন্য অসিয়ত নেই' এ হাদীস দ্বারা অসিয়তের আয়াতটি রহিত হয়েছে, কিংবা হাদীসটিকে যদি মিরাসের আয়াতের বর্ণনাকারী হিসাবে ধরে নেয়া হয় তাহলে যুগপৎ হাদীস ও মিরাসের আয়াত, দু'টো দ্বারাই অসিয়তের আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে৩০ অধিকাংশ হানাফী আলেমগণ এ মত পোষণ করেন।৩১

ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ আলেমের মতও এটাই।৩২

এ সকল আলেমগণের মতে 'অসিয়তে ওয়াজিবা' হচ্ছে সে অসিয়ত যা ঋণ, ধার দেয়া ও আমানাত সম্পর্কে করা হয়। তারা ইবনে উমারের উপরোক্ত হাদীসটিকে অসিয়তে ওয়াজিবার এ অর্থে প্রয়োগ করে থাকেন।৩৩

তবে সবদিক বিবেচনা করে সার্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম মতটিকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে গ্রহণ করা যায় এবং তা নিম্নলিখিত কারণে ঃ

এক ঃ অসিয়তের আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক কোন কিছু কুরআন কারীমের অন্য আয়াতে নেই। কেননা নাসেখ ও মানসুখ এর মধ্যে contradiction বা বিরোধ থাকা জরুরি, যাতে উভয়ের মধ্যে কোন মতেই সঙ্গতি সাধন করা না যায়। বরং অসিয়তের এ আয়াত ও মিরাসের আয়াতসমূহের মধ্যে একটা সুসঙ্গতি স্থাপন করা সম্ভব। সেটি এভাবে যে, মিরাসের আয়াতসমূহ ওয়ারিসদেরকে নির্ধারণ করে তাদের প্রাপ্য অংশ বর্ণনা করেছে। আর অসিয়তের আয়াত আত্মীয়ের শ্রেণী নির্ধারণ না করেই বিষয়টিকে উন্মুক্ত রেখেছে। সে আলোকে যে সব আত্মীয় মিরাস পাবে না তাদের জন্য অসিয়ত করা যাবে।

দুই ঃ আত্মীয়-স্বজনকে সম্পদের কিয়দংশ দেয়া প্রসঙ্গে কুরআনে একাধিক আয়াত এসেছে, যেগুলো মানসুখ হয়েছে এমন কথা কেউই বলেননি। এসব আয়াতের মধ্যে রয়েছে ঃ

'এবং আত্মীয়-স্বজনকে দেবে তার প্রাপ্য।' [সূরা আল-ইসরা ঃ ২৬]

'এবং তাঁর (আল্লাহর) ভালবাসায় আত্মীয়-স্বজনকে ধন-সম্পদ প্রদান করে।' [সূরা আল-বাকারা ঃ ১৭৭]

তিন ঃ বাবা কিংবা মায়ের জীবদ্দশায় অনেক সময় সন্তানের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে থাকে। বাবা-মায়ের মৃত্যুকাল পর্যন্ত যদি সে সন্তান জীবিত থাকতো তাহলে সে তাদের উভয়ের উত্তরাধিকারী হতো। কিন্তু সে তাদের উভয়ের কিংবা যে কোন একজনের পূর্বে মারা যাওয়ার কারণে তার ভ্রাতাগণই শুধু মিরাস পাবে এবং তার সন্তানগণ কঠিন দারিদ্রে পতিত হবে। ইয়াতীম হয়ে উপার্জনক্ষম অভিভাবক হারানো ছাড়াও তাদের কপালে জোটে দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও পারিবারিক সম্পত্তির অসম বণ্টন। ফলশ্রুতিতে মিরাস থেকে লব্ধ সম্পত্তি পেয়ে পরিবারের কেউ হয় বিত্তশালী, আবার বাবার ত্বরিৎ মৃত্যুতে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে কেউ হয় পথের ভিখারী। পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ পরিবারগুলো অধিকাংশ সময়ই বাবা-মায়ের মৃত সন্তানের ছেলেমেয়েদের জন্য অসিয়ত করতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। কিন্তু যুগের হাওয়া আজ পাল্টে গেছে, ধর্মীয় অনুপ্রেরণা কমে গেছে, পারিবারিক সম্প্রীতি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে কিংবা নিঃশেষ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। ফলে আজ ইসলামী শরীয়ত থেকে গৃহীত এমন আইন দ্বারা এ অবস্থার সমাধান হওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে, যা দাদা/দাদীকে তাদের মৃত সন্তানের সন্তান তথা পৌত্র-পৌত্রীর জন্য অসিয়ত করাকে বাধ্য করবে।

অসিয়ত না করলে কি হবে?

ইমাম ইবনে হাযম এ অসিয়তকে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা কর্তৃক বাধ্যতামূলক বলে উল্লেখ করেন।[৩৪]

সে অনুযায়ী যদি মৃত ব্যক্তি উত্তরাধিকারসত্ব পায়নি এমন আত্মীয়দের জন্য অসিয়ত করা থেকে বিরত থাকে, কিংবা সে অসিয়ত তারা করতে চেয়েছিল কিন্তু অসিয়তের পূর্বেই যদি তার মৃত্যু হয়ে

থাকে, তাহলে ওয়ারিসদের কর্তব্য হবে তা করা। যদি ওয়ারিসগণও বিরত থাকে, তাহলে তাদেরকে তা করতে বাধ্য করার ব্যাপারে শাসনকর্তা বা কাযির অধিকার রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে তিনি দলিল হিসাবে নিম্নের হাদীস ও আছার উল্লেখ করেন ঃ

'আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার মা আকস্মিকভাবে মারা যান। আমার মনে হয় কথা বলতে পারলে তিনি সদকা আদায় করতেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে সদকা আদায় করতে পারব? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, 'হাঁ তার পক্ষ থেকে তুমি সদকা আদায় কর।'[৩৫]

যিনি সদকা দেয়ার অসিয়ত করেননি বা করতে পারেননি, তার পক্ষ হতে সদকা আদায় করা হলে তা হবে অত্যন্ত সঙ্গত। এ হাদীসটি সে প্রমাণই বহন করছে। মৃত ব্যক্তির নফল সদকা দিতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে হাদীসটিতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন সদকা আদায়ের জন্য। এর অন্তর্নিহিত অর্থের দিকে লক্ষ্য করলে ওয়াজিব অসিয়তের ব্যাপারটি আরো শক্তভাবে কার্যকর করার ব্যাপারটি বোধগম্য হবে।

'আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, আমার বাবা অসিয়ত না করেই সম্পদ রেখে মারা গিয়েছেন, আমি তার পক্ষ থেকে অসিয়ত করলে তা কি যথেষ্ট হবে? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হাঁ'।[৩৬]

মৃত ব্যক্তি অসিয়ত না করলেও যে অসিয়ত কার্যকর করার উপযোগিতা ক্ষুণ্ন হবে না হাদীসটিতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাঁ-বাচক উত্তর সে দিকের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করছে।

অর্থাৎ তাউস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'অসিয়ত না করে যে কোন মুসলিমই মারা যায়, তার পরিবারবর্গের উচিত তার পক্ষ থেকে অসিয়ত করা।'[৩৭]

এক্ষেত্রে ইবনে হাযম শরীয়তের একটি মূলনীতির উপর তার মতের ভিত্তি স্থাপন করেন। মূলনীতিটি হল, 'জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে শাসনকর্তার অধিকার রয়েছে মুবাহ কোন বিষয়ের হুকুম করা। আর যখনই শাসনকর্তা তা করবে, তা মান্য করা ওয়াজিব হয়ে যাবে'। আবার কোন কোন ফিক্‌হবিদগণ এ মত পোষণ করেন যে, শাসনকর্তার নির্দেশ শরীয়তের হুকুম হিসাবে বিবেচিত হয়।[৩৮]

তাছাড়া অসিয়তকে যদি আমরা বান্দার হক বলে মনে করি, তাহলে মৃত ব্যক্তির অসিয়ত না করা সত্ত্বেও ওয়াজিব হওয়ার কারণে তা নিয়মানুযায়ী কার্যকর করার ব্যাপারটি স্পষ্ট। কেননা ঋণ বা আমানাত প্রভৃতি বান্দার হকের সাথে যা কিছু সংশ্লিষ্ট, মৃতব্যক্তি অসিয়ত না করলেও সেগুলো প্রকৃত দাবীদারদেরকে পৌঁছিয়ে দেয়া বাধ্যতামূলক। আর যদি অসিয়তকে আমরা ধর্মীয় আমল তথা আল্লাহর হক বলে মনে করি, তাহলেও ওয়ারিসদের উচিত এ আমলটি বাস্তবায়ন করা। এর সমর্থন আমরা পেয়ে থাকি নিচের হাদিসটি থেকে ঃ

'ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার মা এক মাসের রোযা ফরয থাকা অবস্থায় মারা যান। এখন এ

রোযাগুলো আমি তার পক্ষ থেকে পালন করব কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হাঁ, কেননা আল্লাহর ঋণ পূরণ করা অধিকতর সমীচীন।' [৩৯]

হিশাম কুবলানের মতে, এক্ষেত্রে ইবনে হাযমের মতটি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণ হল, তার মাযহাব কোন মুসলিম সরকারের পৃষ্টপোষকতা পায়নি, যেভাবে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল অন্যান্য মাযহাবসমূহ।[৪০]

আরো লক্ষ্য করার বিষয় হল, যে সকল দেশের আইনে ওয়াজিব অসিয়তের মাধ্যমে পৌত্র-পৌত্রীকে সম্পত্তি দেয়ার বিধান সম্পর্কে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে (যেমন মিসর, সিরিয়া, লেবানন, কুয়েত) সে সব দেশ -ইবনে হাযমের মতানুসারে- অসিয়ত না করা অবস্থায় বিষয়টিকে রাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থার অধীন করেছেন অর্থাৎ বিধি মোতাবেক যতটুকু অসিয়ত করা ওয়াজিব ছিল, বিচারালয় ততটুকু দেয়ার নির্দেশ কার্যকর করতে পারবে।

অসিয়তের নেসাব

নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির জন্য অসিয়তের সুনির্দিষ্ট কোন নেসাব শরীয়তে নির্ধারণ করা হয়নি। তবে সাধারণভাবে অসিয়তের সর্বোচ্চ নেসাব নির্ধারণ করা হয়েছে, যেমন শুরুতে আমরা বর্ণনা করেছিলাম। তাই সর্বোচ্চ নেসাবের মধ্যে থেকে অসিয়তের পরিমাণের ক্ষেত্রে কমবেশী হতে পারে। কেননা নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারণ হয়ে থাকে শুধু ওয়ারিসদের ক্ষেত্রে। তবে শরীয়তে পরিমাণ নির্ধারিত না হওয়া সত্ত্বেও যদি মৃত ছেলে জীবিত থাকলে যতটুকু পেত পৌত্র-পৌত্রীর জন্য সে পরিমাণ অসিয়ত করা হয়, তা যদি মোট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশি না হয়, তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই।

সৌদী আরবস্থ ইফতা ও ইলমী গবেষণার স্থায়ী কমিটিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ঃ 'এক ব্যক্তির দুই ছেলে, ছয় মেয়ে ও তিন স্ত্রী ছিল। তিনি এখনো জীবিত আছেন। তার বড় ছেলে কয়েকজন ছেলে ও মেয়ে রেখে মারা যায়। উক্ত ব্যক্তি তার বড় ছেলে বেঁচে থাকলে যতটুকু মিরাস পেতো ততটুকু তার সে ছেলের সন্তানদেরকে দিয়ে দিতে চাচ্ছে। এটা কি শরীয়তে জায়েয? যদি মিরাসের ক্ষেত্রে এ সন্তানদেরকে তাদের মৃত বাবার স্থলাভিষিক্ত করা জায়েয না হয়, তাহলে দাদার জন্য নিজের সম্পদ থেকে মৃত ছেলের সন্তানদের জন্য মৃত্যুর পূর্বেই ঐ পরিমাণ অংশ অসিয়ত করা কি জায়েয হবে, যে পরিমাণ উক্ত সন্তানদের বাবা জীবিত থাকলে তার বাবার মৃত্যুর পর পেতো?'

কমিটির উত্তর ছিল ঃ 'উক্ত ব্যক্তির জন্য তার মৃত ছেলের সন্তানদেরকে তাদের বাবা জীবিত থাকলে যে পরিমাণ পেতো সে পরিমাণ দেয়া জায়েয। এ সম্পদ সে তার সুস্থাবস্থায় তাদেরকে দিতে পারে। এছাড়া তার জন্য এটাও জায়েয যে, সে এ সন্তানদের জন্য এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ অসিয়ত করবে, যদি তারা তাদের দাদার ওয়ারিস না হয়ে থাকে এবং যদি এটাই একমাত্র অসিয়ত হয়ে থাকে'[৪১] এ কমিটিকে অন্য আরেকটি প্রশ্নে বলা হয়েছিল : 'আমার একটি বিবাহিত সন্তান পাঁচ সন্তান রেখে মারা যায়। এ সন্তানদের মৃত বাবা আমার সম্পত্তি থেকে তাদের চাচাদের সাথে যতটুকু পাওয়ার অধিকারী ছিল ততটুকু কি আমি তাদের জন্য অসিয়ত করতে পারি? তারা চার

ছেলে ও দুই মেয়ে। আমার জন্য তা জায়েয হবে কিনা আমি সে প্রশ্নের উত্তর আশা করি।' কমিটির উত্তর ছিল ঃ 'আপনার মৃত ছেলের সন্তানদের জন্য এক তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে কম সম্পত্তির অসিয়ত করা আপনার জন্য জায়েয। কেননা তারা আপনার ওয়ারিস নয়।'[৪২]

১. কিতাবুল ফারায়েদ, পৃঃ ৭২।
২. সহীহ বুখারী, কিতাবুল ফারায়েদ, হাদীস নং ৬৭৩৫
৩. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬২৩৫ ও ৬২৩৮, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩০২৮ ও ৩০২৯।
৪. আত-তাহকীকাত আল-মারদিইয়াহ ফিল মাবাহিস আল-ফারাদিইয়াহ, পৃঃ ১১৩
৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫
৬. আত-তাহকীকাত আল-মারদিইয়াহ ফিল মাবাহিস আল-ফারাদিইয়াহ, পৃঃ ২৬০
৭. ইফতা ও ইলমী গবেষণার স্থায়ী কমিটির ফাতাওয়া নং ১৫৭৫০, খণ্ড ১৬ পৃঃ ৪৮৮। এ ফতওয়ার কমিটিতে ছিলেন আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (চেয়ারম্যান), আবদুল্লাহ বিন গুদাইয়ান, ড. সালেহ ফাওযান আল-ফাওযান, আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ আল-শাইখ এবং ড. বকর বিন আবদুল্লাহ আবু যায়েদ।
৮. ইসলামে ওয়াজিব অসিয়তের বিধান পৃঃ ৫৩, ৬০, ৬৩, ৬৪, ৬৯।
৯. নিয়মানুযায়ী' বলতে এখানে শরীয়ত সমর্থিত নিয়মকে বুঝানো হয়েছে। আর তা হল এক তৃতীয়াংশ বা এর কম পরিমাণ অসিয়ত করা। কেননা সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশকে হাদীসে অসিয়তের সর্বোচ্চ নেসাব বলা হয়েছে। তবে সুনির্দিষ্টভাবে কতটুকু পরিমাণ অসিয়ত করবে, আলোচনার শেষ পর্যায়ে 'অসিয়তের নেসাব' শিরোনামে আমরা তা আলোচনা করেছি।
১০. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) এর হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক তৃতীয়াংশের অধিক অসিয়তের অনুমতি দেননি। এছাড়া আরেকটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অর্থাৎ 'আল্লাহ তোমাদের মৃত্যুর সময় তোমাদের এক তৃতীয়াংশ সম্পদকে তোমাদের আমলে বাড়িয়ে দিয়েছেন'। হাজেয ইবনে হাজার আল-হাইসামী বলেন, 'ত্বাবারানী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং হাদিসটির সনদ হাসান'। হাদীসটি ইমাম আহমদ ও দারা কুতনীও বর্ণনা করেন।
১১. তাফসীরে ত্বাবারী ২/১১৫-১১৬।
১২. তাফসীরে ত্বাবারী ২/১১৬, তাফসীরে কুরতবী ২/২৬০।
১৩. নাসায়ী ছাড়া সুনান গ্রন্থসমূহের অন্য সকল গ্রন্থকারগণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে 'হাসান সহীহ' বলে উল্লেখ করেছেন।
১৪. তাফসীরে ত্বাবারী ২/১১৬-১১৭, তাফসীরে কুরতবী ২/২৬০।
১৫. আল-মুগনী ঃ ইবনে কুদামাহ ৬/৪৪৪-৪৪৫।
১৬. আল-মাজমু' ঃ ইমাম নববী ১৫/৩৯৯।

১৭. তাফসীরে কুরতবী ২/২৬০।
১৮. প্রাগুক্ত ২/২৬০।
১৯. তাফসীরে ত্বাবারী ২/১১৫-১১৬,১২১।
২০. প্রাগুক্ত ২/১২১।
২১. তাফসীরে কুরতবী ২/২৬৩।
২২. তাফসীরে ত্বাবারী ২/১১৬।
২৩. প্রাগুক্ত ২/১১৭।
২৪. ফি যিলালুল কুরআন ১/১৬৬।
২৫. তাফসীরুল মানার ২/১৩৬।
২৬. আল-মুহাল্লা , খণ্ড ৯ মাসআলা নং ১৭৪৭।
২৭. আল-মুহাল্লা, খণ্ড ৯ মাসআলা নং ১৭৫১।
২৮. আল-মুহাল্লা, খণ্ড ৯ মাসআলা নং ১৭৫১।
২৮. আল-মুহাল্লা, খণ্ড ৯ মাসআলা নং ১৭৪৯।
২৯. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম।
৩০. তাফসীর আল-মানার ২/১৩৬।
৩১. আহকামুল কুরআনঃআবু বকর আল-জাসসাস ১/৭১, আহকামুল কুরআন ঃ থানুবী, প্রথম খণ্ডের প্রথম ভাগ পৃঃ ৫৭।
৩২. তাফসীরে কুরতবী ২/২৫৯, আল-মাজমু' ১৫/৩৯৯, আল-মুগনী ৬/৪৪৪।
৩৩. আহকামুল কুরআন ঃ আবু বকর আল-জাসসাস ১/৭১, আল-মুগনী ৬/৪৪৫।
৩৪. আল-মুহাল্লা, খণ্ড ৯।
৩৫. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৯৯ ও ২৫৫৪ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৭২, ৩০৮২ ও ৩০৮৩
৩৬. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩০৮১।
৩৭. আল-মুহাল্লা, খণ্ড ৯।
৩৮. ইসলামে ওয়াজিব অসিয়তের বিধান পৃঃ ৫৫।
৩৯. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮১৭, ২৫৫৫ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮।
৪০. প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৩।
৪১. সৌদী আরবস্থ ইফতা ও ইলমী গবেষণার স্থায়ী কমিটির ফাতাওয়া নং ১০৬১৭, খণ্ড ১৬ পৃঃ ৩১৯-৩২০। এ ফতওয়ার কমিটিতে ছিলেন আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (চেয়ারম্যান), আবদুর রাযযাক আফীফী (ভাইস চেয়ারম্যান), আবদুল্লাহ বিন গুদাইয়ান।
৪২. প্রাগুক্ত, ফাতাওয়া নং ১৮৯১৮, খণ্ড ১৬ পৃঃ ৩২৩। এ ফতওয়ার কমিটিতে ছিলেন আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (চেয়ারম্যান), আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ আল-শাইখ (ভাইস চেয়ারম্যান), ড. সালেহ ফাওযান আল-ফাওযান এবং ড. বকর বিন আবদুল্লাহ আবু যায়েদ।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থা : বিচারকের শিষ্টাচার প্রসঙ্গে

মাওলানা মোঃ আতিকুর রহমান

ইসলামী আদালতের একজন বিচারকের যে সব আদব বা শিষ্টাচার বজায় রাখা জরুরি তা তিন প্রকার,

ক. ব্যক্তির সাথে বিচারকের সংশ্লিষ্ট শিষ্টাচার।

খ. বাদী-বিবাদীর সাথে সংশ্লিষ্ট শিষ্টাচার।

গ. সাক্ষীদের সাথে সম্পর্কিত শিষ্টাচার।

ক. বিচারকের কর্মকাণ্ড ও তাঁর ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট শিষ্টাচার

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় একজন বিচারক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি হচ্ছেন মানবাধিকারের সংরক্ষক, দুর্বলের আশ্রয় স্থল, মজলুমের ঢাল। তিনি ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাকারী, অন্যায়ের উৎখাতকারী। রসূল স. এর নায়েব হিসেবে সমাজের কল্যাণ ও সংশোধনের প্রতিভূ এবং অনুকরণীয় প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। সাধারণ ও অসাধারণ নির্বিশেষে সবার দৃষ্টি তাঁর প্রতি নিবদ্ধ থাকে। তাই নিম্নোক্ত শিষ্টাচার সমূহ বজায় রাখা তাঁর জন্য জরুরি।

* বিচারক নিজকে শরয়ী আচার-আচরণ ও নিয়ম-কানুন পালনে অভ্যস্ত করে তুলবেন। মানবিকতাবোধ, আত্ম-মর্যাদাবোধ সম্পন্ন, নির্ভিক ও সাহসিকতার নমুনা হিসেবে নিজেকে পেশ করতে হবে। এমন সব পন্থা অবলম্বন করা থেকে তাঁকে দূরে থাকতে হবে যা তাঁর দীন ও ঈমান, ভদ্রতা ও মনুষ্যত্ব এবং জ্ঞান-বুদ্ধিকে কালিমালিপ্ত এবং তাঁর পদ-মর্যাদা ও প্রভাব খর্ব করতে পারে।
* বিচারককে কল্যাণের অন্বেষণে চেষ্টা ও সাধনা করতে হবে। লোকদেরকে আশ্রয় ও ভয়ের মাধ্যমে কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে হবে এবং সত্য ও ন্যায়ের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে।
* স্বীয় পদ-মর্যাদার অহংকার এবং পার্থিব ভোগ-বিলাসের আকাঙ্ক্ষাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
* একজন বিচারক কিছুতেই অসচ্চরিত্র, কর্কশ ভাষী ও কঠিন হৃদয়ের অধিকারী হতে পারবেন না। অন্যায়-অত্যাচার হিংসা-বিদ্বেষ থেকে তাকে মুক্ত ও পবিত্র থাকতে হবে।

লেখক : গবেষক ও প্রাবন্ধিক। সভাপতি : ইসলাম প্রচার সমিতি বাংলাদেশ।

* বিচারকের মধ্যে ন্যায় ও সত্য প্রকাশে বিন্দুমাত্র দুর্বলতা থাকতে পারবে না এবং তিনি কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব বা আনুকূল্য প্রদর্শন করবেন না। অপ্রয়োজনীয় কঠোরতা ও অহেতুক উদারতা থেকেও তাকে বিরত থাকতে হবে।

* তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ হবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র এবং চাল-চলন ও ওঠা বসায় থাকবে গাম্ভীর্য। তাঁর কথা বলা ও নীরব থাকার মাঝেও থাকবে সম্মোহনী শক্তি ও গাম্ভীর্যের ছাপ।

* বলার সময় বিচারক প্রতিটি কথা বিচার বিবেচনা ও মাপজোক করে বলবেন এবং স্পষ্ট ভাষায় সাফ সাফ কথা বলবেন। যা কিছু দেখবেন বিচক্ষণতার দৃষ্টিতে দেখবেন।

* হযরত উমর বিন আবদুল আজীজ বলেছেন, একজন বিচারকের মধ্যে যদি পাঁচটি গুণ বর্তমান থাকে তবে তিনি পূর্ণাঙ্গ বিচারক আর এর একটিও যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে মনে করতে হবে একটি দিক থেকে তার মধ্যে অপূর্ণতা রয়েছে। পাঁচটি গুণ হচ্ছে :

১. 'দালীলিক জ্ঞান।' অর্থাৎ কুরআন সুন্নাহ, আছারে সাহাবা (সাহাবীদের কথা, কাজ ও সমর্থন) এবং মুজতাহিদ ইমামগণের বিভিন্ন মতামতের বিষয়ে তাঁর পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। এ জ্ঞান তার প্রতিটি জটিল বিষয়ে পথ নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে। পক্ষান্তরে এ জ্ঞানের অভাব তাকে বিপথগামী করে ছাড়বে।

২. 'লোভ-লালসা থেকে পবিত্র থাকা।' কেননা মানুষের ধন-সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি এবং জাগতিক আরাম আয়েশ ও বিলাস বহুল জীবন যাপনের স্পৃহাই নৈতিক অধপতনের ও বিপর্যয়ের মূল উৎস। আর নিষ্ঠা ও পরহেযগারীই হচ্ছে সফলতার চাবিকাঠি।

৩. 'সংযম ও সহিষ্ণুতা' অনেক অনভিপ্রেত কথা তাঁকে উপেক্ষা করতে হবে এবং বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের অনেক কথা তাকে চোখ বুজে শুনে যেতে হবে। তবে এ সহিষ্ণুতার মধ্যে কোনো 'দুর্বলতা' থাকতে পারবে না।

৪. 'কোনোরূপ নিন্দাবাদের পরোয়া না করা।' অর্থাৎ ফায়সালা দেয়ার সময় তাঁর সামনে থাকবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চিন্তা ও তাঁর অসন্তুষ্টির ভয়, যদি মানুষের তিরস্কার ও নিন্দাবাদকে তিনি ভয় করেন এবং তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করেন তাহলে ন্যায় বিচার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।

৫. 'বিশেষজ্ঞ আলেমদের সাথে পরামর্শ করা।' অর্থাৎ যদিও বিচারক নিজেই একজন আলেম বা জ্ঞানী ব্যক্তি তবুও আলেম ও বিজ্ঞজনদের পরামর্শ গ্রহণে কখনো কুণ্ঠাবোধ করবেন না। কেননা এটা রসূল স. এর সুন্নাত এবং সাহাবা কিরামদেরও সুন্নাত।

বিচারকের হাদিয়া বা উপঢৌকন গ্রহণ

মু'আয ইবনে জাবাল রা. বলেন, নবী করীম স. আমাকে আমীর নিয়োগ করেন। আমি রওনা করলে এক ব্যক্তিকে দিয়ে আমাকে ফেরৎ ডেকে পাঠান এবং বলেন, জানো! আমি কেনো তোমাকে ডেকেছি? আমার অজ্ঞাতসারে কোনো বস্তু গ্রহণ করবে না। কেননা এটা হবে খেয়ানত। আর যে

খেয়ানত করবে কিয়ামতের দিন খেয়ানতের মালসহ সে উপস্থিত হবে। এ কথা বলার জন্যই তোমাকে ডেকেছি। এবার নিজের কাজে যাও।'

উমাইর কিন্দি বলেন, আমি রসূল আকরাম স. কে মিম্বরে বসে বলতে শুনেছি, 'আমি যাকে কোনো দায়িত্বে নিয়োগ করি সে যদি একটি সুঁই বা তার চাইতেও কম মূল্যের কিছু আমার কাছ থেকে গোপন করে তবে তা হবে খেয়ানত- যা নিয়ে কিয়ামতের দিন সে উপস্থিত হবে।'

নবী করীম স. বলেছেন: 'আমীর-উমরাদেরকে প্রদত্ত হাদিয়া ঘুষের অন্তরভুক্ত।'

নবী করীম স. ইবনুল্ লাতবিয়া নামক এক ব্যক্তিকে 'আমেলে সাদাকাহ (জাকাত উসূলকারী) হিসেবে নিয়োগ দিয়ে পাঠান। সে ফেরৎ এসে বললো, এ সব মাল আপনাদের অর্থাৎ বাইতুল মালে জমা হবে আর এগুলো আমি হাদিয়া হিসেবে পেয়েছি। একথা শুনে নবী করীম স. মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, এটা কেমন কথা। এক ব্যক্তিকে আমি কোনো দায়িত্বে নিয়োগ করি। সে এসে বলে, এগুলো তোমাদের আর এটা আমি হাদিয়া (উপঢৌকন) হিসেবে পেয়েছি। সে তার বাপ-মায়ের গৃহে বসে থেকে দেখে নেয় না কেন কেউ তাকে এরূপ হাদিয়া দেয় কি না। সেই সত্তার কসম যার মুষ্টিতে আমার প্রাণ, যে কোনো ব্যক্তি এ ধরনের মাল গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন তা কাঁধে নিয়ে তাকে উঠতে হবে তা উট হোক, গাভী হোক কিংবা বকরী। অতঃপর রসূল স. হাত উত্তোলন করে বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি পৌছে দিয়েছি। হে আল্লাহ! আমি কি পৌছে দিয়েছি।

উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মাণ হয়, যে সব লোক কোনো দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে, বিচারক হোক কিংবা প্রশাসক, তাদের জন্যে এ ধরনের কোনো উপঢৌকন গ্রহণ অবৈধ যা উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকার কারণে তাকে দেয়া হয় কিংবা যে ক্ষেত্রে এরূপ অপবাদের অবকাশ থাকে। কেননা এ ধরনের হাদিয়া নিজের আওতায় নেয়া হিকমতের নূরকে নিষ্প্রভ করে দেয়। নিজের মধ্যে হীনমন্যতা বোধ সৃষ্টি হয় যা সত্য প্রকাশে দুর্বলতা ও অন্যায়কে 'দেখেও না দেখার ভান' করার মনোভাব জাগ্রত করে। এ জন্যেই রাবী'আ ইবনে' আমের বলেছেন : 'হাদীয়া গ্রহণ থেকে বিরত থাক। কারণ এটি ঘুষের পথ উন্মুক্ত করে।'

নবী করীম স. ইরশাদ করেন, এমন এক যুগ আসবে যখন হাদিয়ার নাম করে হারাম মালকে হালাল করা হবে এবং শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনের নামে অবৈধ হত্যাকে বৈধ করা হবে। নিরপরাধ লোকদেরকে এ যুক্তি দেখিয়ে হত্যা করা হবে যে, এ থেকে জনসাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নবী করীম স. এর হাদিয়া গ্রহণের ব্যাপারটা তাহলে কেমন? তিনিও তো মদীনার রাষ্ট্রপতি ছিলেন। এর জবাব হচ্ছে, প্রথমত তাঁর ব্যাপারটা স্বতন্ত্র। হাদিয়া গ্রহণ ছিল তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব। দ্বিতীয়ত তিনি ছিলেন মাসূম বা নিষ্পাপ তার সত্তা কোনোরূপ অপবাদের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া সম্ভব ছিল না যা অন্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাই তো ইসলামের পঞ্চম খলীফা নামে খ্যাত হযরত উমর বিন আবদুল আজীজ বলেছেন: যে জিনিসটি নবী করীম স. এর জন্য হাদিয়া ছিল আমাদের জন্য তা ঘুষ।

মোট কথা, বিচারক এবং এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি জনসেবায় নিয়োজিত, তার হাদিয়া গ্রহণ করা বৈধ নয়। হাঁ, যদি হাদিয়া তাদের কোনো নিকট আত্মীয় বা এমন বন্ধু বান্ধবের পক্ষ থেকে আসে যারা বিচারক পদে অধিষ্ঠিত হবার পূর্বেও তাকে গিফট করতো তবে তা গ্রহণ করা বৈধ হবে। কিন্তু ঐ বিচারকের আদালতে যদি তার কোনো মামলা বিচারাধীন থাকে কিংবা বিচারকের পদ গ্রহণের পূর্বে যে মূল্যমানের হাদিয়া দেয়া হতো বর্তমান হাদিয়া তার চাইতে অধিক মূল্যমানের হয় তাহলে এ হাদিয়া কবুল করা তার জন্য বৈধ হবে না।

সার কথা হচ্ছে দাতার যদি হাদিয়া বা উপঢৌকন প্রদানের উদ্দেশ্য হয় বিচারকের কাছ থেকে কিছুটা সুবিধা লাভ করা কিংবা এরূপ অপবাদের সুযোগ সৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা বর্তমান থাকে তাহলে এ হাদিয়া গ্রহণ করা বিচারকের পক্ষে কখনো উচিত নয়।

যাদের কাছ থেকে যে সকল অবস্থায় হাদিয়া গ্রহণ বৈধ নয়, তাদের কাছ থেকে সে সকল অবস্থায় ঋণ গ্রহণ বা কোনো কিছু ধার নেয়াও বিচারকের জন্য বৈধ নয়। অনুরূপভাবে লোকদের কাছ থেকে সাধারণ জিনিসপত্র চাওয়া থেকেও তাতে বিরত থাকতে হবে।

বিচারকের জন্য দাওয়াত কবুল করার নীতিমালা

একজন বিচারক যেমন হাদিয়া গ্রহণ করতে পারেন না তেমনি এমন কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানেও তিনি অংশ গ্রহণ করতে পারেন না যার আয়োজন করা হয়েছে একমাত্র তাঁকে কেন্দ্র করেই। তবে যে কোনো সাধারণ দাওয়াতে তিনি অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

আপন আত্মীয়-স্বজন ও বিশেষ বন্ধু-বান্ধবের দাওয়াতে তিনি শরীক হতে পারেন। বিয়ে-শাদী ও ওয়ালিমার দাওয়াতেও তিনি অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

এ বিষয়টির প্রতি সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যদি দাওয়াতের উদ্দেশ্য হয় তাকে প্রভাবিত করা এবং তার পদ মর্যাদাকে কাজে লাগিয়ে ফায়দা হাসিল করা, তাহলে এ দাওয়াত তিনি গ্রহণ করতে পারবেন না।

মামলার বাদী-বিবাদী কোনো পক্ষের দাওয়াত তিনি কোনো অবস্থাতেই কবুল করবেন না। কেননা এতে অপবাদের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

রোগী দেখতে যাওয়া ও জানাযায় শরীক হওয়া

বিচারক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে এবং মৃত ব্যক্তির জানাযায় শরীক হতে পারেন। কেননা এটা সুন্নাত এবং মুসলমানদের পারস্পরিক অধিকার। তবে রোগী দেখতে যাওয়ার ব্যাপারে শর্ত হচ্ছে, রুগ্ন ব্যক্তি মামলার কোনো পক্ষ হতে পারবে না এবং রোগী দেখতে গিয়ে তার কাছে দীর্ঘ সময় অবস্থান করবেন না।

বিচারক কর্তৃক আদালতের বাইরে কোনো পক্ষকে মামলা সম্পর্কিত কোনো কথা বলার সুযোগ দেয়া যাবে না। অবশ্য মামলার ব্যাপারে কোনো প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসা থাকলে তা করতে পারে। জনসাধারণের নিকট অবাধ যাতায়াত থেকে তিনি বিরত থাকবেন।

মন্দ লোকদের সংশ্রব থেকে তিনি দূরে থাকবেন এবং তাদের নিকট কোনো গোপন বিষয় প্রকাশ করবেন না। বরং দীনদার, আমানতদার, ন্যায়পরায়ণ ও পরহেযগার লোকদেরকে সাথে রাখবেন এবং তাদেরকে নির্ভরযোগ্য মনে করবেন। এরা বিচারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে তার সাহায্যকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারেন।

কোনো এক পক্ষকে নিভৃতে তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেবেন না।

কোনো এক পক্ষকে দাওয়াত দিয়ে অতিথেয়তা করবেন না।

মামলার শুনানী, সরেজমীনে তদন্ত এবং বিচারের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রয়োজনে যদি বিচারককে সফর করতে হয় তবে তাঁর উচিত যাদেরকে সাথে রাখা খুবই জরুরি কিংবা সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও জুলুমের প্রতিরোধে যাদের কাছ থেকে তিনি সাহায্য নিতে আগ্রহী এমন লোক ছাড়া অন্য কাউকে সফর সঙ্গী না করা।

তাঁর আবাসস্থলে জনসাধারণের অবাধ যাতায়াত এবং ভীড় জমানো মোটেও সমীচীন নয়। তবে আলেম, দীনদার, আমানতদার ও হিতোপদেশ দানকারী ব্যক্তিদের ব্যাপার স্বতন্ত্র।

বিচারের ক্ষেত্রে বিচারকের কখনো কারো সম্পর্কে এমন বাক্য উচ্চারণ করা উচিত নয় যদ্বারা তাঁর নিকট উক্ত ব্যক্তির বিশেষ মর্যাদা রয়েছে বলে অনুমিত হয়। অথবা যার ফলে মামলার রায় প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা থাকে।

এমন লোকদের কথায় বিচারকের কর্ণপাত করা উচিত নয় যারা সর্বদা অন্যদের বদনাম করে বেড়ায় অপরের দোষ-ত্রুটি অন্বেষনে ব্যস্ত থাকে।

বিচারকের বিচারকার্য, তাঁর চরিত্র এবং তাঁর কার্যক্রমের ব্যাপারে জনগণের রায় ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবশ্যই তার অবগত থাকা উচিত।

বিচারকের উচিত তাঁর সহকর্মী ও সহযোগীবৃন্দকে সৎ ব্যক্তিদের নীতি অনুসরণে অভ্যস্ত করে তোলা এবং তাঁর অধীনে এমন লোকদের নিয়োগ দেয়া যারা হবে নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন। কেননা কোনো ব্যক্তিকে তার সাথী ও সহযোগীদেরকে দিয়েই মানুষ বিচার করে থাকে। তাছাড়া বিচারকের সহযোগী হিসেবে যারা কাজ করে তাদের নিকট কোনো পক্ষের এমন অনেক বিষয় জানা থাকে যা অপর পক্ষের জানা উচিত নয়। এমনিভাবে বাদী বা বিবাদী হিসেবে মহিলাদেরও যাতায়াত থাকবে। সুতরাং বিচারালয়ে কর্মচারী হিসেবে যারা নিয়োজিত থাকবে তাদের প্রত্যেককে কর্ম ও চরিত্রের দিক থেকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

বিচারকের এজলাস ও তাঁর আবাসস্থল

বিচারকের এজলাস প্রশস্ত হওয়া উচিত। স্থানটি হবে খোলামেলা, যেখানে যাতায়াতকারীদের জন্য সাধারণ অনুমতি থাকবে। তার কক্ষ হবে আলো-বাতাসযুক্ত। যাতে সেখানে বসে কেউ সহসা হাঁফিয়ে না ওঠে। সেখানে থাকবে বিচারকের জন্য বাথরুম, তাৎক্ষণিক বিশ্রাম ও খাওয়া-দাওয়ার জন্য উপযুক্ত স্থান এবং ঠাণ্ডা-গরম ও রোদ-বৃষ্টি থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা।

বিচারকের এজলাস এমন স্থানে হতে হবে যে স্থানটি এলাকাবাসীর নিকট সুপরিচিত। যাতে করে সাধারণ মানুষের সেখানে পৌঁছানো কষ্টকর না হয়।

এজলাসের জন্য যদি কোনো স্থান নির্ধারিত থাকে তবে সেখানেই মামলার শুনানী হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ একদিকে স্থানটি সকলের জানা থাকে। অপরদিকে এতদুদ্দেশ্যেই স্থানটি নির্ধারণ করা হয়েছে। যার ফলে কারো পক্ষ থেকে কোনোরূপ অভিযোগের সুযোগ থাকে না। আর যদি এজলাসের জন্য কোনো স্থান নির্দিষ্ট না থাকে তবে জামে মসজিদ অথবা মহল্লার মসজিদকে এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা সমীচীন। কারণ লোকদের নিকট পরিচিত হওয়ার দরুন সেখানে যাতায়াত সহজ। অনুরূপভাবে বিভিন্ন বিদ্যালয় কিংবা সাধারণ স্থান (Public Place) একাজের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে। যেখানে যাতায়াতে কারো আপত্তি বা অনীহা থাকে না। আর বিচারক যদি স্বীয় বাসগৃহে কিংবা অন্য কোনো স্থানে মামলার শুনানীর ব্যবস্থা করেন তাতেও তাঁর রায় কার্যকর হবে এবং শুনানী বৈধ বলে বিবেচিত হবে।

মামলার বাদী বা বিবাদী কারো আবাসস্থলে শুনানী হওয়া উচিত নয়। হাঁ, কোনো এক পক্ষ যদি পর্দানশীন মহিলা বা রুগ্ন অথবা মা'যূর (অক্ষম) হয় এবং বিকল্প কোনো ব্যবস্থা করাও সম্ভব না হয়, এমতাবস্থায় তাদের আবাসস্থলেও শুনানী করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, অপরপক্ষ এবং তার আইনজীবী ও সাক্ষীর উপস্থিতির ব্যাপারে কোনো বিধি নিষেধ থাকতে পারবে না। মোট কথা, এটা অবশ্যই জরুরি যে, যেখানে এজলাস বসবে সেখানে প্রবেশের ব্যাপারে কোনোরূপ বাধা বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাবে না।

বিচারালয়ে মধ্যমানের গালিচা এবং বিচারকের জন্য স্থান ও আসনের ব্যবস্থা থাকা উচিত। বিচারকের আসনটি মজলিসের মাঝ বরাবর থাকবে। যাতে করে প্রতিটি আগমন নির্গমণকারীর প্রথম দৃষ্টি তার প্রতি নিবদ্ধ হয় এবং আসনটি এতটুকু ব্যতিক্রমধর্মী হতে হবে যাতে এক নজরে তাকে চিনতে পারা যায়। অবশ্য বিচারকের আসনটি কিবলামুখী হওয়াটা উত্তম।

বিচারকের পোশাক পরিচ্ছদ

সর্বোত্তম পোশাক হচ্ছে তাকওয়া বা পরহেযগারীর পোশাক। তাই আল্লাহর ভয়, আখেরাতে জবাবদিহির অনুভূতি, বিচক্ষণতা ও জ্ঞান-বুদ্ধির প্রখরতা, কোনো বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করার ক্ষমতা এবং স্বীয় বিবেককে বাইরের যাবতীয় সম্পর্ক ও প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখাই হচ্ছে একজন বিচারকের সব চাইতে মূল্যবান পোশাক। অতঃপর বাহ্যিক পোশাক যাই হোক তাতে কোনো অসুবিধা নেই। অবশ্য যদি আল্লাহর ভয় না থাকে এবং জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার অভাব থাকে তখন প্রভাব ও পদমর্যাদার বহিঃপ্রকাশের জন্য বাহ্যিক নামীদামী পোশাকের প্রয়োজন হয়। তবে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞদের সেই পোশাক পরিধান করা উচিত যা বিচারকদের পোশাক (ইউনিফরম) হিসেবে সুপরিচিত। মোট কথা, একজন বিচারক সাধারণত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লেবাস পরিধান করেন। শরীর ও পোশাক দুর্গন্ধ মুক্ত থাকবে। উত্তম পোশাকে এজলাসে আসবেন। যাতে করে মজলিসের মধ্যে তাঁকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলে অনুভব করা যায়।

মামলার শুনানীর সাথে সংশ্লিষ্ট আদব

বিচারক এজলাসে বসা অবস্থায় কথা কম বলবেন। বেশির ভাগ সময় নীরবতা ও গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। সওয়াল-জওয়াবের মধ্যেই তার কথাবার্তা সীমাবদ্ধ রাখবেন। উচ্চস্বরে কথা বলবেন না। অবশ্য কোনো বিষয়ে সতর্ক করা বা আদব শিক্ষা দেয়া যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা আলাদা। বিনা প্রয়োজনে শরীর নড়াচড়া করা বা কারো দিকে ইঙ্গিত করে কোনো কথা বলা তাঁর পক্ষে উচিত নয়।

পুলিশ তাঁর সামনে দন্ডায়মান থাকবে। প্রয়োজন মত উভয়পক্ষ ও সাক্ষীদেরকে ডেকে তাঁর সামনে হাজির করবে এবং নিয়ম মাফিক তাদেরকে নিজ নিজ স্থানে বসিয়ে দেবে। এক কথায় সর্বাবস্থায় বিচারকের পদ সমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

এজলাসে বসার পূর্বে বিচারকের উচিত দু' রাকা'আত নফল নামায পড়া এবং নামায শেষে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করা- যা নবী করীম স. ঘর থেকে বের হবার সময় পাঠ করতেন বলে হাদীস থেকে জানা যায়। অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ্ চাই পদস্খলন থেকে কিংবা কারো দ্বারা পদলিত হওয়া থেকে। আমি যেনো বিপথগামী না হই অথবা কেউ যেনো আমাকে বিপথগামী না করে। আমি যেনো জুলুম না করি অথবা জুলুমের শিকার না হই। আমি যেনো কারো সাথে বর্বর আচরণ না করি কিংবা কারো বর্বর আচরণের শিকার না হই।' ইমাম শা'বী উপরোক্ত দু'আর সাথে নিম্নোক্ত বাক্যগুলোও যোগ করেছেন। 'আমি যেনো কারো প্রতি বাড়াবাড়ি না করি এবং কারো বাড়াবাড়ির শিকার না হই। হে আল্লাহ্ জ্ঞান দ্বারা আমাকে সাহায্য কর, সহিষ্ণুতার গুনে আমাকে ভূষিত কর। তাকওয়া দ্বারা আমাকে সম্মানিত কর। যাতে কথা বললে যেনো সত্য বলি, ফয়সালা দিতে গিয়ে যেনো ন্যায় বিচার করি।' এই দু'আটি মামলা শুনানীর প্রারম্ভে পড়া মুস্তাহাব।

বিচারকের কিবলামুখী হয়ে বসা উত্তম

বিচারক অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে মামলার শুনানী ও রায় প্রদান করবেন। কোনোরূপ অস্থিরতা, বিরক্তি কিংবা বিব্রত অবস্থায় শুনানী ও রায় প্রদান করা যাবে না। শুনানী চলাকালীন সময়েও যদি কোন প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয় তবে শুনানী মূলতবী রাখবেন। যেমনঃ ক্ষুধার্ত অবস্থায় মামলার শুনানী করা যাবে না। কেননা ক্ষুধা ক্রোধের উদ্রেক করে। অনুরূপভাবে ভরা পেটেও এজলাসে বসবে না। কারণ এতে অলসতার ভাব সৃষ্টি হয় এবং বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার দ্যুতি নিস্প্রভ হয়ে যায়। মনে কোনোরূপ চিন্তা -ভাবনার উদয় হলেও শুনানী স্থগিত রাখবেন। কেননা একাজটি পুরোপুরি মস্তিষ্ক ও চিন্তার সাথে সম্পৃক্ত, যা বিশেষ একাগ্রতা ও স্থিরচিত্ততার দাবী করে। সুতরাং এমন কোনো অবস্থায় বিচার কার্য পরিচালনা করা উচিত নয় যখন বিচারক মানসিকভাবে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারছেন না। যেমন প্রকৃতির ডাক এলে কিংবা রাগান্বিত অবস্থায়। অনুরূপভাবে নিদ্রা চেপে বসলে অথবা বিরক্তি ও ক্লান্তি বোধ করলে বিচার কার্য চালিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

বিচারের মজলিসে বিচারক তার নিজের জন্য কোনো বস্তু কেনা-বেচা করবেন না। এজলাসে বসে কোনোরূপ হাসি-তামাশা বা কৌতুক জাতীয় কথাবার্তায় মশগুল হওয়া যাবে না। অপ্রয়োজনীয়

বাক্যালাপ ও গল্প-গুজব করা থেকে বিরত থাকতে হবে। বিচারের মজলিসে বিচারকের সামনে কেউ উচ্চ-স্বরে কথা বলতে পারবে না। এজলাসে বসা অবস্থায় বিচারক পুরোপুরি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। তবে এ গাম্ভীর্যের সাথে যেনো ক্রোধের মিশ্রণ না থাকে। এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এজলাসে বসে থাকবেন না যাতে বিরক্তির উদ্রেক হয়, বরং সাধ্যমত সকালের দিকে কিছু সময় এবং দুপুরের পর যতোক্ষণ সম্ভব হয় বসবেন।

বিচারের মজলিসে বিশেষজ্ঞের উপস্থিতি এবং তাদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ

বিচারের মজলিসে আলেম ও ইসলামী আইনবিদদের উপস্থিত থাকা উত্তম। কেননা অনেক সময় তাঁদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন পড়তে পারে। কখনো মামলার কোনো বিশেষ দিক বিচারকের দৃষ্টির অগোচরে থেকে যেতে পারে। এমতাবস্থায় আলেম ও ফকীহগণ সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে আলেম ও ফকীহর সাক্ষ্যেরও প্রয়োজন হতে পারে। এক্ষেত্রে বিচারককে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ভরা মজলিসে জনতার সামনে আলেমদের পরামর্শ গ্রহণ কিংবা তাদের কাছ থেকে কিছু জানতে চাওয়ার কারণে যদি তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকা থাকে এবং মূর্খ জনগণ এই জানতে চাওয়াকে বিচারকের অজ্ঞতা মনে করে তাহলে এমতাবস্থায় জনগণের সামনে পরামর্শ না চাওয়াই উত্তম। বরং লোকদেরকে বিদায় করে দিয়ে কিংবা লিখিত আকারে অথবা এমন ভাষায় পরামর্শের ব্যাপারে আলাপ করবে যা দু'পক্ষের লোকেরা বুঝতে না পারে। আর আলেম ওলামার উপস্থিতির কারণে যদি বিচারকের প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে এজলাসে তাঁদের বসানো উচিত নয়। বরং এজলাস শেষে সরাসরি কিংবা পরবর্তীতে পত্রযোগে তাঁদের কাছ থেকে পরামর্শ নেয়া যেতে পারে। মোট কথা, যে কোনো জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হলে বিচারকের উচিত আলেম ও ফকীহগণের পরামর্শ গ্রহণ করা।

বিচারক মামলার রায় কখন দেবেন?

বিচারকের কর্তব্য হচ্ছে উভয় পক্ষের বক্তব্যের প্রতি গভীর ভাবে মনোযোগ দেয়া। একাগ্রচিত্তে, মনোনিবেশ সহকারে দু'পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করা এবং ভালোভাবে বিষয়টিকে উপলব্ধি করে গভীরে পৌছার চেষ্টা করা। যতক্ষণ না বিষয়টি পুরোপুরি বুঝে আসবে কোনো ফায়সালা না দেয়া।

মামলায় কোনোরূপ সমস্যা বা জটিলতা অনুভব করলে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা। সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিচারক যদি বিষয়টির প্রকৃত তত্ত্ব উঘাটনে সক্ষম না হন এবং চূড়ান্ত রায় প্রদানের জন্য যতটা নিশ্চিত ও আশ্বস্ত হওয়া প্রয়োজন ততটা না হতে পারেন তাহলে এমতাবস্থায় দেখতে হবে এ জটিলতা কি উভয় পক্ষের দাবী বা অভিযোগ নিরূপণের ক্ষেত্রে নাকি শরীআতের হুকুম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে। যদি অভিযোগ নিরূপণের ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেয় তবে বিচারক পুনরায় উভয় পক্ষকে তলব করবেন এবং নতুন করে তাদের বক্তব্য ও সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন। আর যদি শরী'আতের হুকুম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হয় তবে বিচারকের উচিত এ মামলা অন্য কোনো বিচারকের আদালতে রেফার করা। উপরোক্ত পদ্ধতি

অবলম্বনের পরও যদি জটিলতার নিরসন না হয় তবে বিচারকের উচিত, মামলাটি যদি মীমাংসার যোগ্য বলে বিবেচিত হয় তাহলে উভয় পক্ষকে আপস-মীমাংসার নির্দেশ প্রদান করা।

দু'পক্ষের মাঝে আপস-মীমাংসার নির্দেশ

যদি উভয় পক্ষের মধ্যে আপস রফার সম্ভাবনা দেখা যায় তবে বিচারকের উচিত দু'পক্ষের মধ্যে আপস-মীমাংসার ব্যবস্থা করা। কেননা অনেক সময় মামলার রায়ের ফলে বিদ্বেষ ও শত্রুতার আগুন তীব্র আকার ধারণ করে।

বিশেষ করে তিনটি অবস্থা এমন রয়েছে যাতে সত্য উদঘাটিত হওয়া সত্ত্বেও বিচারকের উচিত দু'পক্ষকে আপস-রফার জন্য তাগিদ করা।

প্রথম অবস্থা : যখন এমন আশংকা হয় যে রায় ঘোষণার ফলে দু' পক্ষের মধ্যে শত্রুতার আগুন জ্বলে উঠবে এবং ঝগড়া-বিবাদ খতম হওয়ার বদলে আরো দীর্ঘায়িত হবে।

দ্বিতীয় অবস্থা: উভয় পক্ষই সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। এমতাবস্থায় রায় প্রকাশের ফলে তাদের অনেক গোপন রহস্য ফাঁস হবার এবং মানহানি ঘটার আশংকা দেখা দেবে।

তৃতীয় অবস্থা : উভয় পক্ষই পরস্পর নিকটাত্মীয়। এমতাবস্থায় পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে যা কিছু সিদ্ধান্ত হবে তা ভবিষ্যতে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অটুট রাখার ব্যাপারে সাহায্য করবে।

অনুরূপভাবে ফকীহদের কারো কারো মতে নিম্নোক্ত দু'টো অবস্থায়ও আপস-মীমাংসার নির্দেশ দেয়া উচিত।

১. সবলতা ও দুর্বলতার দিক থেকে উভয়পক্ষের সাক্ষ্য-প্রমাণ যদি সমপর্যায়ের বা কাছাকাছি হয়। হতে পারে এক পক্ষের বক্তব্য বা যুক্তি তর্ক (Argument) অন্য পক্ষের তুলনায় অধিক জোরালো হয় তবে মীমাংসার প্রস্তাব করবেন।

২. বাদীর দাবী বা অভিযোগ এমন বিষয় বা ঘটনার সাথে জড়িত যা দীর্ঘ দিনের পুরনো হওয়ার কারণে তার আলামত বা চিহ্ন মুছে গেছে, যার ফলে বিষয়টি এতটা সন্দেহ ও সংশয়পূর্ণ হয়ে পড়েছে যে, কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া খুবই কষ্টকর। অবশ্য বিচারকের নিকট যদি এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যে, এক পক্ষ জুলুমকারী ও অপর পক্ষ জুলুমের শিকার, এমতাবস্থায় বিচারক চূড়ান্ত রায় প্রদান করতে বাধ্য।

বাদী-বিবাদীর সাথে সংশ্লিষ্ট শিষ্টাচারসমূহ

বিচারকের সামনে যখন উভয় পক্ষ উপস্থিত হবে, কথাবার্তা, দৃষ্টি আকর্ষণ ও মনোযোগ দেয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিচারক উভয় পক্ষের সাথে সম-আচরণ করবেন। হোক কেউ আমীর অথবা গরীব, কেউ সম্ভ্রান্ত বা নিম্নশ্রেণীর, কেউ শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত, কেউ মুসলিম এবং কেউ কাফের। উভয় পক্ষকে একই সময়ে বিচারকের সামনে হাজির করবে। একপক্ষকে আগে এবং অপর পক্ষকে পরে এমনটা যেনো না হয়।

যখন বাদী আদালতে তার অভিযোগ পেশ করবে তখন বিচারক বিবাদীকে স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি দিতে অথবা অস্বীকৃতি জানাতে বলবেন।

যদি এক পক্ষ অপর পক্ষের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করে কিংবা অশালীন ভাষা ব্যবহার করে, অভিযোগের জবাব না দিয়ে জালেম অথবা পাপিষ্ট ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করে, এমতাবস্থায় বিচারক ঐ পক্ষকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করতে পারেন এবং অবস্থা ভেদে শাস্তিও দিতে পারেন।

কোনো পক্ষ যদি কোনো সাক্ষীকে গাল-মন্দ করে এবং তাকে মিথ্যাবাদী বলে তাহলে বিচারকের কর্তব্য, সাক্ষীর মর্যাদাগত দিক এবং ঐ পক্ষের অবস্থা বিচার-বিবেচনা করে তার শাস্তির ব্যবস্থা করা।

সাক্ষী গ্রহণ কালে বিচারক উভয়পক্ষকে নীরব থাকার নির্দেশ দেবেন। যদি কোনো পক্ষ তার নির্দেশ অমান্য করে এবং শুনানীর সময় পাল্টা এমন কথা বলতে থাকে যার ফলে সাক্ষী নির্বিঘ্নে তার বক্তব্য পেশ করতে সক্ষম না হয়, তখন বিচারক ঐ পক্ষকে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার বজায় রাখার জন্য সতর্ক করে দেবেন।

মামলার কোনো এক পক্ষ যদি মহিলা হয় এবং তার উপস্থিতির কারণে যদি কোনোরূপ ফিৎনা বা অনাকাংখিত পরিস্থিতি সৃষ্টির আশংকা থাকে তাহলে বিচারক তার পক্ষ থেকে কাউকে উকীল নিয়োগ করার নির্দেশ দিতে পারেন। এমতাবস্থায় তাকে আদালতে হাজির হওয়ার ব্যাপারে বাধ্য করার কোনো অধিকার অপরপক্ষের থাকবে না। আর যদি সরাসরি তার বক্তব্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বিচারক স্বীয় নায়েবকে তার বাড়ীতে পাঠান তাহলে পর্দার আড়াল থেকে তার বক্তব্য গ্রহণ করবেন। এ ধরনের মামলার ক্ষেত্রে বিচারক বিশেষ করে এমন ব্যক্তিকে তার নায়েব করে পাঠাবেন যিনি পরহেযগারী ও আমানতদারীর দিক থেকে তাঁর নিকট নির্ভরযোগ্য।

যদি উপস্থিত মামলা হয় এবং উভয় পক্ষ তাদের অভিযোগ নিয়ে বিচারালয়ে হাজির হয়, (কে বাদী আর কে বিবাদী তা নির্দিষ্ট নয়) এমতাবস্থায় হয়ত বিচারক চুপ থাকবেন এবং কোনো এক পক্ষ থেকে কথা শুরুর জন্য অপেক্ষা করবেন। নয় তো কোন এক পক্ষকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা এখানে কি জন্য এসেছ?

হলফের প্রয়োজন হলে বাদীর মৌখিক অথবা লিখিত আবেদনের পরই বিচারক বিবাদির কাছ থেকে হলফ নেবেন। হলফ নেয়ার সময় বাদী সরাসরি কিংবা তার উকিলের হাজির থাকা জরুরি। যদি বাদীর অভিযোগ বা দাবী সুস্পষ্ট বা মা'মুলী হয় তাহলে তৎক্ষণাৎ জওয়াব দেয়া বিবাদীর জন্য জরুরি। আর যদি অভিযোগ জটিল এবং তদন্ত সাপেক্ষ বিষয় হয় তাহলে মামলার ধারা ও প্রকৃতি অনুযায়ী বিবাদীকে জবাবদিহির জন্য প্রয়োজনীয় অবকাশ দেয়া উচিত।

যদি বিবাদী আদালতে হাজির হয়ে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয় তবে তার স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং তাতে তার দস্তখত বা আঙ্গুলের ছাপ নিতে হবে এবং বিচারক স্বয়ং

স্বীকারোক্তির কপি সত্যায়িত করে দস্তখত করবেন। অতঃপর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে মামলার রায় দেবেন।

মামলার শুনানী কালে বিচারক উভয় পক্ষের অবস্থা, তাদের চেহারার ভাব-ভঙ্গী, কথাবার্তার ধরন, পরিবর্তিত প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন। যদি কোনো পক্ষের আচার-আচরণ, কর্তাবার্তার ধরন, পরিবর্তিত প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে তার সন্দেহ হয় যে তারা কোনো কিছু গোপন করছে তখন বিচারককে প্রকৃত সত্য উদঘাটনের জন্য সূক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বিচক্ষণতার সাথে কোনো একটি উপায় অবলম্বন করতে হবে। এতদসত্ত্বেও যদি বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ধরা না পড়ে এবং তাঁর সন্দেহ অটুট থাকে তাহলে তিনি তাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখাবেন, হিতোপদেশ দেবেন এবং বলবেন, সত্য গোপন করে রায় হাসিল করা আল্লাহর নিকট কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এসব শুনে যদি তারা সত্য প্রকাশ করে দেয় তাহলে তো ভাল, নয় তো বাহ্যিক সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই বিচারক রায় ঘোষণা করবেন। কিন্তু তদন্ত ও অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে যদি সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয় তাহলে এমতাবস্থায় রায় প্রদানের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করা যাবে না। বরং বিভিন্ন পন্থায় অনবরত তদন্ত ও অনুসন্ধান চালিয়ে প্রকৃত সত্য উদঘাটনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না তিনি সত্যের নাগাল পান অথবা তাঁর সন্দেহ দূরিভূত হয়।

বিচারকের কর্তব্য উভয় পক্ষকে হিতোপদেশ দেয়া এবং তাদেরকে একথা বুঝিয়ে দেয়া যে যারা 'অন্যায়' দাবী করে এবং অবৈধ পন্থায় মামলায় জয়ী হয় তারা মূলত আল্লাহর অসন্তুষ্টি খরীদ করে এবং যারা মিথ্যা কসম খেয়ে কারো হক বা অর্থ-সম্পদ আত্মসাত করে তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম।

সাক্ষীদের বক্তব্য শোনার ক্ষেত্রে সহজ পন্থা অবলম্বন করা উচিত। টালবাহানা এবং অযথা বিলম্ব করার মাধ্যমে কোনো কঠিন অবস্থার সৃষ্টি করা উচিত নয়, এরূপ করা হলে বিচার প্রার্থীর পক্ষে সাক্ষীদেরকে একত্র করা দুষ্কর হয়ে পড়বে। হতে পারে মামলার দীর্ঘসূত্রিতা ও কষ্টের ভয়ে হকদার তার ন্যয্য হক ত্যাগ করবে কিংবা নিজের ক্ষতি স্বীকার করে আপস-মীমাংসার জন্য বাধ্য হবে। যদি কোনো পক্ষ দুর্বল হয় এবং আশংকা জাগে, সবল ও প্রভাবশালী প্রতিপক্ষের মুকাবিলায় সে নিঃস্ব হয়ে যাবে এবং স্বীয় অধিকার প্রয়োগ বা প্রকাশ করতে পারবে না। এমতাবস্থায় বিচারকের উচিত, দুর্বল পক্ষের সাথে এমন আচরণ করা যাতে নিজের দুর্বলতার কারণে সে যে মানসিক চাপের মধ্যে আছে তা থেকে মুক্ত হয়ে সাহসিকতার সাথে নিজের অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। যাতে করে ইনসাফ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মাঝে সমতা সৃষ্টি হয়।

দলিল প্রমাণ হাজির করার জন্য প্রত্যেক পক্ষকে প্রয়োজনীয় অবকাশ দেয়া উচিত। যাতে করে বাদী তার অভিযোগ প্রমাণ করার এবং নিজকে বেকসূর প্রমাণ করার পূর্ণ সুযোগ লাভ করে। এভাবে বিচারকের পক্ষে রায় প্রদান যেমন সহজ হবে তেমনি পক্ষদ্বয়ের বির্তকের আর সুযোগ থাকবে না। তবে অবকাশের মেয়াদ এত দীর্ঘ হওয়া উচিত হবে না যা অপর পক্ষের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বিচারকের কর্তব্য উভয় পক্ষের দীর্ঘ বক্তব্য ধৈর্যের সাথে শ্রবণ করা। বিরক্তি প্রকাশ না করা। কারণ অনেক সময় দীর্ঘ বক্তব্য ও প্রাসংগিক কথার মধ্য দিয়েও সত্য কথা বেরিয়ে আসে এবং মামলার বিশেষ কোনো গোপন দিক বিচারকের সামনে উন্মোচিত হয়ে পড়ে। এছাড়া বিচার প্রার্থিও এই ভেবে প্রশান্তি লাভ করে যে সে তার মনের সব কথা খুলে বলতে পেরেছে। হ্যাঁ, বিচারক যদি মনে করেন, অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্যের দীর্ঘ ফিরিস্তি সীমা লংঘন করছে তখন বিচারক কৌশলে তা থামিয়ে দেবেন অথবা কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবেন।

বিচারক যেনো বিচার প্রার্থীদের সামনে বিবর্ণ চেহারা নিয়ে হাজির না হন। কারণ এর ফলে লোকেরা সত্য প্রকাশের সাহস হারিয়ে ফেলে। কোনো পক্ষের সাথে ইশারা ইংগিতে কোনো কথা বলবেন না। এমনকি এজলাসে বসে অন্য কারো দিকেও কোনো রূপ ইংগিত করা যাবে না।

সাক্ষীদের সাথে সংশ্লিষ্ট শিষ্টাচারসমূহ

* বিচারকের সামনে যখন সাক্ষীদের নাম দাখিল করা হবে এবং যারা সাক্ষ্য দেবে তাদের নাম নির্দিষ্ট হয়ে যাবে বিচারক তখন সাক্ষ্য দাতাদেরকে পক্ষদ্বয় থেকে আলাদা করে বিশেষ স্থানে বসাবেন। সাক্ষীদের সাথে আন্তরিক ও সম্মানজনক আচরণ করবেন।
* মামলার পক্ষদ্বয়ের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে যেমনটা সমতা বিধান করা জরুরি সাক্ষীদের ক্ষেত্রে অনুরূপ সমতা বিধান জরুরি নয়। বরং এক্ষেত্রে সাক্ষীদের শিক্ষা দীক্ষা সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের সাথে সম্মানজনক আচরণ বাঞ্ছনীয়।
* আদালতের মর্যাদা ও পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রেখে এজলাসের বাইরে যদি বিচারক সাক্ষীদের সাথে পরস্পর কথাবার্তা বলেন অথবা খোলামেলা আচরণ করেন তাতে কোনো দোষ নেই।
* শুনানী কালীন সময় বিচারক সাক্ষীদেরকে আলাদা বসার জন্য আদেশ দিতে পারেন। উচিত হচ্ছে সাক্ষীদেরকে এমন স্থানে বসানো যে স্থানটি বিচারকের গোচরীভূত থাকে। তবে বিচারক যদি সবাইকে বিচারের মজলিসেই বসতে দেন তাতেও কোনো অসুবিধা নেই।
* বিচারক আদালতে সাক্ষীদের সাথে এমন কোনো কথা বার্তা বলবেন না যা বিচারাধীন মামলা ও সাক্ষ্যের সাথে সম্পর্কহীন।
* সাক্ষ্য প্রদানের সময় বিচারক সাক্ষীকে কোনো কথা যোগ-বিয়োগ করে সহযোগিতা করবেন না এবং সাক্ষ্য অমিল হওয়ার কারণে জেরাও করবেন না। যেমন: বাদীর দাবীর সাথে সাক্ষীর সাক্ষ্য মিলছে না এমতাবস্থায় বিচারক সাক্ষীর মুখ দিয়ে এমন কথা বের করানোর চেষ্টা করবেন না যাতে অমিল দূর হয়ে যায়।
* সাক্ষী তার সাক্ষ্যের বিষয় কোন সূত্রে অবগত হয়েছে বিচারক তাকে এ প্রশ্ন করবেন না। সাক্ষী নিজে যদি অবগত হওয়ার সূত্র সুস্পষ্ট করে দেয় তার উত্তর যদি মূল মামলার প্রকৃত তত্ত্ব উদঘাটনে তা সহায়ক হয়। আর সূত্র প্রকাশ করার ফায়দা লাভের কোনো সম্ভাবনা না থাকে তাহলে তা পরিহার করাই উত্তম।

* বিচার প্রার্থীর উচিত বিচারকের নিকট তার সাক্ষীদের নাম পেশ করে আদালতে তাদের হাজির করার অনুমতি গ্রহণ করা। সাধারণত তলব করা নাহলে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য সাক্ষীদের হাজির হওয়া উচিত নয়।
* ক্রমধারা অনুসারে সাক্ষীদের ডাকা উচিত। তবে বিশেষ কোনো যুক্তি সংগত কারণে কিংবা কোনো সাক্ষী স্বেচ্ছায় তার নাম পিছিয়ে দিতে রাজী থাকলে বিচারক ক্রমধারা ভঙ্গ করে আগে পরেও ডাকতে পারেন।
* একজনের সাক্ষ্য দান সমাপ্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় সাক্ষী এসে যদি বলে, আমি ঐ সাক্ষ্যই দিচ্ছি যা পূর্ববর্তী সাক্ষী দিয়েছে। অথবা বলে যে, আমি পূর্ববর্তী সাক্ষীর সত্যায়ন করছি। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় সাক্ষ্য সঠিক হবে না। কারণ এটি সাক্ষ্য দান নয়। এটি হচ্ছে উপাখ্যান। বিচারকের উচিত এক সাক্ষীর দ্বারা অপর সাক্ষীর সত্যায়ন না করে ঘটনার বিবরণ প্রত্যেক সাক্ষীর কাছ থেকে শব্দে শব্দে শোনা এবং লিপিবদ্ধ করা। এমনটা না করে যদি শুধু একজন সাক্ষীর বর্ণনাকে অপর সাক্ষীদের দ্বারা সত্যায়িত করিয়ে নেয়া হয় তাহলে এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

তথ্য সূত্র ঃ

* মুঈনুল হুক্কাম
* মাবসূত
* বাদায়েউস্ সানায়ে
* দুররে মুখতার
* তিরমিযী শরীফ

রফতানি বাণিজ্যের শরয়ী বিধান

বিচারপতি আল্লামা তকী উসমানী

বিক্রির সময় নির্দিষ্টকরণ

রফতানির ক্ষেত্রে বিক্রির পয়েন্ট অফ টাইম বা সময় নির্দিষ্ট হওয়া শরয়ী দৃষ্টিতে অত্যাবশ্যকীয়। আর এটা প্রচলিত বাণিজ্য আইনেও। বিক্রির পয়েন্ট অফ টাইম কি? যে পয়েন্ট অফ টাইমের ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যায় এবং এই পয়েন্ট অব টাইমের ভিত্তিতে দায় রফতানি কারকের জিম্মা থেকে আমদানিকারকের জিম্মায় বর্তায়। এছাড়া আরো বহু বিষয় শরয়ী ও আইনিভাবে পয়েন্ট অফ টাইম নির্দিষ্টকরণের উপর নির্ভর করে। অতএব পয়েন্ট অফ টাইম নির্দিষ্টের জন্য বিক্রয় ও বিক্রয় চুক্তির ভেতরকার পার্থক্য পরিষ্কারভাবে জানা দরকার।

বিক্রয় ও বায়না চুক্তির পার্থক্য

শরীয়াহ ও প্রচলিত আইনের দৃষ্টিতে বিক্রি ও বায়না চুক্তির মাঝে বিস্তর ফারাক রয়েছে যদিও Contract শব্দটি উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। একই Contract শব্দ বিক্রয় ও বায়না চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে উভয় Contract এর মাঝে শরীয়াহ ও প্রচলিত আইনের দিক দিয়ে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

প্রথম পার্থক্য : যে পণ্যের এগ্রিমেন্ট টু সেল তথা বায়না হয় সে পণ্য পূর্ণ বিক্রিত পণ্য নয়, শুধু এতটুকু যে বিক্রেতা পণ্যের ব্যবস্থা করবে আর ক্রেতা মূল্য পরিশোধ করবে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়। এতে কারো মালিকানা পরিবর্তন হয় না।

দ্বিতীয় পার্থক্য : প্রচলিত আইন হল: বিক্রয়ের পর পণ্যের মালিকানা পরিবর্তনের সাথে সাথে পণ্যের দায় ও পরিবর্তন হয়। যেমন : আমি টেপ রেকর্ডার ক্রয় করে বিক্রেতার নিকট রেখে দিলেও পণ্যের দায় থাকবে আমার উপর। এই হলো বর্তমান আইন, টেপ রেকর্ডারটি বিক্রেতার কাছ থেকে হারালে, নষ্ট হলে বা চুরি হয়ে গেলেও ক্রেতা তার কাছে পণ্যের দাবি করতে পারবে না, সম্পূর্ণ ক্ষতিটা ক্রেতার উপর দিয়ে যাবে, আইনের সাহায্যে বিক্রেতার কাছ থেকে ভর্তুকীর

লেখক: পাকিস্তানের শরীয়া কোর্টের সাবেক বিচারপতি। আন্তর্জাতিক ইসলামী স্কলার।

দাবী করা চলবে না। কারণ ক্রয়ের সাথে সাথে পণ্যের রিস্ক ও ক্রেতার দিকে পরিবর্তিত হয় যদিও পণ্য বিক্রেতার হেফাজতে থাকে।

পক্ষান্তরে শরীয়তের বিধান হলো, মালিকানা ও রিস্ক উভয়টি সম্পূর্ণ হক। শুধুমাত্র মালিকানা পরিবর্তন হলেই রিস্ক পরিবর্তন হয় না, রিস্ক পরিবর্তনের জন্য ক্রেতার কবজা হওয়া জরুরি। অতএব টেপ রেকর্ডার ক্রেতার হেফাজতে না আসা পর্যন্ত তার রিস্ক ক্রেতার উপর বর্তাবে না, কব্জা নিজে করুক বা ক্রেতার কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে পণ্য কব্জা করুক।

তৃতীয় পার্থক্য : এগ্রিমেন্ট টু সেল হওয়ার পর পণ্য অন্যের নিকট বিক্রি করা বৈধ, তবে তা অনৈতিক। নৈতিকতা ব্যবসায়ীদের অমূল্য সম্পদ। যেমন : আমি মামুনের সাথে টেপ রেকর্ডার ক্রয়ের চুক্তি করলাম, তবে ক্রয় এখনো করিনি। কিন্তু মামুন আমার নিকট বিক্রি না করে মাসউদের নিকট বিক্রি করল। মাসউদ টেপ রেকর্ডারের পূর্ণ মালিক হবে, আমি মাসউদকে আমার পণ্য ক্রয়ের অভিযোগ করতে পারব না, কিন্তু মামুন আমার কাছে বিক্রি না করে অনৈতিক কাজ করল এবং আমি মামুনের নিকট ক্ষতি পূরণ দাবি করতে পারব, কিন্তু টেপ রেকর্ডার মাসউদ থেকে ফিরিয়ে আনার কথা বলতে পারব না। আর যদি আমার সাথে মামুনের পূর্ণ কেনা-বেচা হয়ে গিয়ে থাকত আর আমি টেপ রেকর্ডার তার নিকট রেখে আসতাম এরপর সে মাসউদের নিকট বিক্রি করত তবে আমি মামুনকে মাসউদ থেকে টেপ রেকর্ডার ফিরিয়ে আনতে বাধ্য করতে পারতাম। এ অবস্থায় দ্বিতীয় বিক্রি অবৈধ হত।

চতুর্থ পার্থক্য : এগ্রিমেন্ট টু সেল সম্পাদিত হওয়া অবস্থায় বিক্রেতা দেউলিয়া হলে ক্রেতা পণ্যের দাবি করতে পারবে না। বিক্রেতা সে পণ্য অন্যের নিকটও বিক্রি করতে পারবে। কিন্তু পূর্ণ বিক্রয় হয়ে থাকলে বিক্রেতা অবশ্যই পণ্য ক্রেতাকে বুঝিয়ে দিবে অন্যথায় ক্রেতা তার কাছ থেকে যে কোন উপায়ে পণ্য বুঝে নিতে পারবে। বিক্রেতা সে পণ্য অন্য কারো কাছে বিক্রি করতে পারবে না। এ পর্যন্ত বিক্রয় ও বিক্রয় চুক্তির ভেতরকার কিছু পার্থক্য সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

অর্ডারের সময় পণ্যের অবস্থা

অর্ডারের সময় পণ্যের কয়েকটি অবস্থা হয়ে থাকে। যেমন : অনেক ক্ষেত্রে অর্ডারের সময় বিক্রেতার কাছে পণ্য প্রস্তুতই থাকে না। বিক্রেতা পণ্য ক্রয়ের অর্ডার পেয়ে নিজের ফ্যাক্টরিতে বানায়, অন্যের ফ্যাক্টরিতে বানায় অথবা বাজার থেকে খরিদ করে। অথবা অর্ডারের সময় পণ্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকে।

অর্ডারের সময় পণ্য প্রস্তুত হলে

অর্ডার প্রাপ্তির সময় যদি অর্ডারী পণ্য পূর্ণ প্রস্তুত থাকে তাহলে এগ্রিমেন্ট টু সেল এর কোন প্রয়োজনই নেই। সেক্ষেত্রে সরাসরি পূর্ণ বিক্রয় হবে। বিক্রেতা মূল্য বুঝে নিবে আর ক্রেতা পণ্য বুঝে নিবে, এ অবস্থায় শরীয়তের কোন আপত্তি নেই।

অর্ডারের সময় পণ্য অপ্রস্তুত হলে

অর্ডারের সময় যদি পণ্য অপ্রস্তুত থাকে, নিজের বা অন্যের ফ্যাক্টরিতে তৈরি করতে হয় বা বাজার থেকে খরিদ করতে হয় এক্ষেত্রেও পূর্ণ বিক্রয় সম্ভব, কারণ: প্রচলিত আইনে বিক্রির সময় পণ্যের মালিকানা জরুরি নয় পক্ষান্তরে শরীয়ত বলে: পণ্য বিক্রি করতে হলে মালিকানা, দখল সত্ত্ব বা পণ্য প্রস্তুত থাকা জরুরি, আর যদি এসব না থাকে তবে এগ্রিমেন্ট টু সেল হতে পারবে, পূর্ণ বিক্রয় হতে পারবে না।

প্রশ্ন : এগ্রিমেন্ট টু সেল হওয়ার পর কখন পূর্ণ বিক্রি হবে। 'এখন পূর্ণ বিক্রি হল, এখন মালিকানা পরিবর্তন হল, এখন রিস্ক পরিবর্তন হল' এ কথাগুলো কখন বলা যাবে?

উত্তর : এগ্রিমেন্ট টু সেল হওয়ার পর অর্ডার তৈরি সম্পন্ন হলে মাল ডেলিভারির অপেক্ষায় থাকে। সেক্ষেত্রে দুটি পন্থায় পূর্ণ বিক্রি হতে পারে, অর্ডারি পণ্য তৈরি হয়ে গেলে ক্রেতার সাথে নতুন করে পূর্ণ বিক্রির ইযাব (প্রস্তাব) কুবল (গ্রহণ) করবে। এতেই পূর্ণ বিক্রি সম্পাদিত হবে। আমদানিকারকের সাথে পূর্ণ বিক্রির জন্য ইযাব কবুলের ক্ষেত্রে সরাসরি সাক্ষাত হওয়া জরুরি নয়, বরং যে কোন উপায়ে ইযাব কবুল সম্পাদন হলেই যথেষ্ট।

অপর ছুরত হচ্ছে : নতুন করে ইযাব কবুল ছাড়াই পূর্ণ বিক্রয় সম্পাদন, যা শরয়ী পরিভাষায় 'বাইয়ে তাআতী' বলে পরিচিত। শিপিং কোম্পানি ইম্পোর্টারের নিযুক্ত প্রতিনিধি হওয়ার কারণে অর্ডারি পণ্য শিপিং কোম্পানিকে বুঝিয়ে দিলে 'বাইয়ে তাআতী' হওয়ায় পূর্ণ বিক্রি সম্পাদিত হবে, তখন পণ্যের সকল প্রকার দায়-দায়িত্ব ইম্পোর্টারের উপর বর্তাবে। সার কথা হচ্ছে পণ্য প্রস্তুত থাকলে অর্ডারের সময় এগ্রিমেন্ট টু সেল না করে সরাসরি পূর্ণ বিক্রি করতে পারবে। আর যদি তখন পণ্য অপ্রস্তুত থাকে তবে ইম্পোর্টারের এজেন্ট শিপিং কোম্পানি বুঝে নিলেই কেবল পূর্ণ বিক্রি হবে। অথবা নতুন করে ইযাব কবুল করে পূর্ণ বিক্রয় করবে। এছাড়া সরাসরি পূর্ণ বিক্রয় করতে পারবে না এ হলো বিক্রয়ের পয়েন্ট অব টাইম।

পণ্যের রিস্ক পরিবর্তন

শিপমেন্ট পদ্ধতি সাধারণত: তিনভাবে হয়ে থাকে যথা- * F.O.B. C and F. * C. i. F.

FOB পদ্ধতিতে জাহাজ পর্যন্ত পণ্য পৌছে দিলেই এক্সপোর্টারের দায়িত্ব শেষ। জাহাজ ভাড়াসহ সকল প্রকার খরচাদি ইম্পোর্টার বহন করে, এক্ষেত্রে শিপিং কোম্পানি ইম্পোর্টারের এজেন্ট হওয়ার কারণে পণ্যের রিস্ক ইম্পোর্টারের জিম্মায় পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

C and F পদ্ধতিতে জাহাজ ভাড়া এক্সপোর্টারকে বহন করতে হয়, তবে শিপিং কোম্পানি ইম্পোর্টারের এজেন্ট হিসাবে কাজ করে। এ পদ্ধতিটি শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়ায় শিপিং কোম্পানি পণ্য বুঝে নিলে পণ্যের রিস্ক ইম্পোর্টারের দিকে পরিবর্তন হয়ে যাবে।

C i F পদ্ধতি C and F পদ্ধতির অনুরূপ। তবে পার্থক্য হচ্ছে, এক্সপোর্টার ইম্পোর্টারের পক্ষ থেকে পণ্যের বীমা করে দিতে হয়। বীমার লাভ ইম্পোর্টার ভোগ করে অতএব এ পদ্ধতির বিধান C and F পদ্ধতির অনুরূপ।

FOB, C and F ও C i F শিপিং পদ্ধতিগুলো শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়ায় শিপিং কোম্পানী পণ্য বুঝে নিলে পণ্যের দায় ইম্পোর্টারের দিকে পরিবর্তন হয়ে যাবে।

এগ্রিমেন্ট টু সেল পূর্ণ না করা

এগ্রিমেন্ট টু সেল করার পর এক্সপোর্টার ওয়াদা ভঙ্গ করলে ইম্পোর্টার তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারবে কি না? অথবা ইম্পোর্টার অর্ডার নিতে অস্বীকার করলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যাবে কি না?

প্রচলিত আইনে এগ্রিমেন্ট টু সেল ভঙ্গ করলে যার ক্ষতি হবে সে ক্ষতিপূরণের দাবি করতে পারবে। দাবি আদায় না করলে মামলা করে দাবি আদায় কতে পারবে।

পক্ষান্তরে শরয়ী বিধান হলো, ওয়াদা পূরণ করা জরুরি ওয়াদাটা চারিত্রিক বিষয়, আর এগ্রিমেন্ট টু সেল ওয়াদা হওয়ায় তা ভঙ্গ করলে শরীয়তের পক্ষ থেকে কোন চাপ প্রয়োগ করা যাবে না। অভিযুক্ত ব্যক্তির এ ক্ষেত্রে ওয়াদা ভঙ্গের পাপের ও আল্লাহর অভিসম্পাতের অধিকারী হবে। পার্থিব জগতে এর কোন বিহিত নিজেদের হাতে করা যাবে না। তবে ওয়াদা পূরণের নিমিত্তে তাকে প্রেসার দেয়া যেতে পারে।

এর উপমা 'বাগদান'। বাগদান বিবাহের ওয়াদাকে বলে যা একটি লেনদেনের মত বাগদানের পর বাগদত্তা বিয়ে না করলে তাকে বিয়ের জন্য চাপ প্রয়োগ করা যাবে না, তবে সে ওয়াদা ভঙ্গ করে অনৈতিক কাজ করার জন্যে সামাজিকভাবে ধিকৃত হবে। বাগদত্তা বিয়ের ওয়াদা করেছিল এখন বিয়ে করছে না এ মর্মে আদালতে মামলা ঠুকে দেয়া যাবে না। সাধারণ ওয়াদা আর বিয়ের ওয়াদা একই পর্যায়ভুক্ত। তবে বাণিজ্যিক ওয়াদার মূল্য অনেক বেশি। কারণ অর্ডার প্রাপ্তির পর পণ্য তৈরি শুরু করে দেয় এতে বিক্রেতার অর্থ ব্যয় হয়। এমতাবস্থায় ক্রেতা পণ্য নিতে অস্বীকার করলে বিক্রেতার ক্ষতি হয়। এজন্য কিছু সংখ্যক বিজ্ঞ ফিকাহবিদ আদালতের মাধ্যমে বিক্রেতা ক্রেতার কাছ থেকে দাবী আদায় করতে পারবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আদালত দুটি বিষয়ে উভয়কে ওয়াদা পূরণে বাধ্য করবে। যেমন– যদি বিক্রেতা বিক্রি করতে অস্বীকার করে তবে বিক্রি করতে বাধ্য করবে আর যদি ক্রেতা কিনতে অস্বীকার করে তবে আলাদত তাকে কিনতে বাধ্য করবে। অথবা কারণবশতঃ ওয়াদা পূরণে অক্ষম হলে কিছু সংখ্যক ফিকাহবিদ তার থেকে ড্যামেজ (লোকসান) আদায় করার পক্ষে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

চুক্তি ভঙ্গের (Damage) ড্যামেজ-এর ব্যাখ্যা

শরীয়ত অনুমোদিত ড্যামেজ (লোকসান) আর প্রচলিত ড্যামেজ (লোকসান)-এর মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে।

বর্তমানে 'সম্ভাব্য লাভ' (আপারচুনেটি কস্ট) এর উপর ভিত্তি করে ড্যামেজ আদায় করা হয়ে থাকে। যেমন, কারো সাথে এগ্রিমেন্ট টু সেল হওয়ার পর ক্রেতা পণ্য নিতে অস্বীকার করায় পণ্য

অন্যের নিকট বিক্রি করতে হয়, প্রথম এগ্রিমেন্ট টু সেল-এ কতো লাভ হত আর দ্বিতীয় বিক্রিতে কতো লাভ হয়েছে। এর মাঝের অংশটাকে ড্যামেজ হিসাবে ধরা হয়। আর এই ড্যামেজই আদালতের মাধ্যমে আদায় করা হয়ে থাকে। অথবা ক্রেতা পণ্য ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত টাকা জমা করে রাখল, ব্যবসায় খাটাল না, (ইন্টারেস্টরায়ার স্কিম) অর্ডার ডেলিভারির সময় বিক্রেতা অর্ডার ডেলিভারি করতে অপারগতা প্রকাশ করলে ক্রেতার ক্ষতি হয়। কারণ ক্রেতা পণ্য আটকে রেখেছিল, এতদিন অন্য ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে অনেক মোনাফা পেত। অতএব ক্রেতা আদালতের মাধ্যমে বিক্রেতার নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে।

লোকসানের (ড্যামেজের) শরয়ী ব্যাখ্যা

এ জাতীয় লোকসান (ড্যামেজ)-কে শরীয়ত সমর্থন করে না। শরীয়ত দুটি বিষয়কে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখে, লাভ না হওয়া লোকসান হওয়া। লাভ না হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে পরিমাণ লাভের আশা করা হয়েছিল সেই পরিমাণ লাভ না হওয়া আর লোকসান হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পণ্য তৈরিতে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে সে টাকা অনাদায় থাকা। আজকাল লাভ না হওয়াকেও লোকসান বলে চিহ্নিত করা হয়।

যেমন কোন ব্যবসায়ী দশ টাকা মূল্যমানের পণ্য পনের টাকা বিক্রি করে এতে পাঁচ টাকা লাভের আশা করে কিন্তু কোন কারণে পণ্যটি যদি বার টাকায় বিক্রি করতে হয় তবে দেখা যায় আশার চেয়ে তিন টাকা কম মূল্যে পণ্যটি বিক্রি হলো। এটাকেও ব্যবসায়ীরা লোকসান বলে চালিয়ে দেয়। অথচ এটি শরীয়তের দৃষ্টিতে লোকসান নয়।

দশ টাকা মূল্যমানের পণ্যটি যদি নয় টাকায় বিক্রি করে তবে সেক্ষেত্রে বলা হবে এক টাকা লোকসানে বিক্রি হয়েছে। এটিই প্রকৃত শরয়ী লোকসান, আপার চুনেটি কস্ট (সম্ভাব্য লাভের) হিসাবে যে লোকসান ধরা হয় তা শরীয়ত সমর্থন করে না।

এক্সপোর্টের জন্য মূলধন সংগ্রহ, (কালেকশন)

আগে মানুষ চাঁদ দেখে পা বাড়ত কিন্তু বর্তমনে মানুষ প্রথমে পা বাড়িয়ে পরে চাঁদের তালাশ করে। এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে 'ডকুমেন্ট ক্রেডিট' অতীব প্রয়োজনীয়। অর্ডার পেলেই এক্সপোর্টার পণ্য বানানোর ফিকির করে। অর্ডারের সময় পণ্যের কোন নাম নিশানাও থাকে না। এমনকি এক্সপোর্টারের নিকটও অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মূলধন থাকে না। আমরা এরূপ ব্যবসার চারিত্রিক দিককে বাদ দিয়ে শরয়ী দিক বিবেচনা করছি। অর্ডারী পণ্য তৈরি করার জন্য যে মূলধন প্রয়োজন তা কালেকশনের জন্য এক্সপোর্টার ব্যাংক বা ঋণ সংস্থার নিকট ধরণা দেয়। তাদের কাছ থেকে মূলধন কালেকশন করে অর্ডারী পণ্য তৈরি করে সাপ্লাই করে। একে 'এক্সপোর্ট' ফাইনেন্সিং' বলে। এ ব্যাপারে সকল ব্যাংক ও ঋণদাতা সংস্থাগুলো অনেক অগ্রগামী। তবে এদের লেনদেন অধিকাংশই সুদের ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

এক্সপোর্ট ফাইনেন্সিং পদ্ধতি

এক্সপোর্ট ফাইনেন্সিং এর দুটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে যথা :

(১) পূর্ণ শিপমেন্ট ফাইনেন্সিং

(২) পোস্ট শিপমেন্ট ফাইনেন্সিং।

পূর্ণ শিপমেন্টের ইসলামী পদ্ধতি

অর্ডার পাওয়ার পর মূলধন কালেকশনের জন্য ব্যাংক বা ঋণদাতা সংস্থার কাছ থেকে ঋণ নেয়। কিন্তু প্রচলিত সকল পদ্ধতি সুদী হওয়ায় এর সুদবিহীন পদ্ধতি আলাদাভাবে তালাশ করা লাগে। সুদবিহীন মূলধন এভাবে হতে পারে।

ব্যাংক বা ঋণ সংস্থার সাথে 'মুশারাকা' পদ্ধতি অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অর্থ লেনদেন হতে পারে। অর্ডার থাকার কারণে পণ্য খরিদ বা পণ্য প্রস্তুতে যাবতীয় খরচাদি, লাভ ও পণ্যের (LC) এল.সি খোলা থাকায় সরবরাহ খরচাদিও নির্দিষ্ট থাকে। অতএব খুব সহজে ব্যাংক বা ঋণ সংস্থার সাথে মুশারাকা বা অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে সুদবিহীন অর্থ লেনদেন করতে পারে। এক্সপোর্টার টাকা নিয়ে পণ্য তৈরি করে সাপ্লাই দিয়ে যে অর্থ উপার্জন হবে তা শতকরা হিসাবে হারাহারি ভাগ করে নিবে। এক্সপোর্টারের মূলধন থাকলে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে, আর যদি তার মোটেও মূলধন না থাকে তবে লেনদেনটি 'মুদারাবা' হয়ে যাবে, মুশারাকা থাকবে না। কারণ মুদারাবাতে থাকে একজনের অর্থ অপর জনের শ্রম। বিনা পুঁজিতে যেহেতু কোন এক্সপোর্টার ব্যবসায় নামে না। তাই এ লেনদেনকে 'মুশারাকা' বলা হয়।

পোস্ট শিপমেন্টের প্রচলিত পদ্ধতি

বিক্রেতা বিলের চেক পাওয়ার পর অর্ডার ডেলিভারি দেয়, কিন্তু বিলের টাকা নগদ পেতে দেরি হওয়ায় ব্যাংক বা ঋণসংস্থায় বিলের কাগজ প্রদান করে টাকা নিয়ে নেয় আর টাকা ক্যাশ হলে তা থেকে তাদের টাকা তারা বুঝে নেয়। এক্ষেত্রে ব্যাংক বা ঋণসংস্থা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কেটে রেখে টাকা প্রদান করে থাকে। যাকে 'বিল ডিসকাউন্ট' বলে। যেমন এক লক্ষ টাকার চেক জমা দিলে ১০% কেটে রেখে নব্বই হাজার টাকা এক্সপোর্টারকে দিয়ে থাকে। আর টাকা ক্যাশ হলে পুরো এক লক্ষ টাকা ঋণ পরিশোধ হিসেবে নিয়ে নেয়, প্রচলিত এ বিল ডিসকাউন্টিং পদ্ধতি সুদী হওয়ায় নাজায়েজ।

বিল ডিসকাউন্টিং এর শরয়ী পদ্ধতি

প্রচলিত বিল ডিসকাউন্টিং পদ্ধতিকে শরীয়তসম্মত করতে দুটি পদ্ধতি রয়েছে।

১ম পদ্ধতি : যদি বিক্রেতা সে পোস্ট শিপমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে চায় তবে অর্ডার ডেলিভারীর পূর্বে ব্যাংক বা ঋণসংস্থাকে মুশারাকা (অংশিদার) করে নিবে তবে বিল ডিসকাউন্টিংয়ে কোন সমস্যা থাকবে না।

২য় পদ্ধতি : এল.সি কম মূল্যে ব্যাংক বা ঋণসংস্থার কাছে বিক্রি করে দিবে এরপর সে এলসি মূলে ইম্পোর্টারের কাছে বিক্রি করবে। এ দু বিক্রয়ের মাঝে যে পার্থক্য হবে সে অংকটাই মোনাফা হবে। যেমন এক লক্ষ টাকার এলসি থাকলে ব্যাংক বা ঋণসংস্থার কাছে পচানব্বই হাজার টাকায় বিক্রি করবে। এরপর তারা ইম্পোর্টারের নিকট এক লক্ষ টাকায় বিক্রি করে পাঁচ হাজার টাকা মোনাফা করবে।

বিল ডিসকাউন্টিং-এর উভয় পদ্ধতি এগ্রিমেন্ট টু সেল-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পূর্ণ বিক্রি হয়ে গেলে বিল ডিসকাউন্টিং পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবে না।

বিল ডিসকাউন্টিং এর আরেকটি শরীয়ত সম্মত পদ্ধতি রয়েছে। যা কিছু শর্ত সাপেক্ষ। এ পদ্ধতির শর্ত পূরণ হওয়া কঠিন এবং সাধারণত পূরণ হয় না বিধায় ব্যাপকভাবে নিষেধ করা হয়। তবে কেউ ইচ্ছা করলে শর্তগুলো পালনের মাধ্যমে পদ্ধতিটি ব্যবহার করতে পারবে।

* বিক্রেতা বিল ডিসকাউন্টিং-এ আগ্রহী ব্যাংক বা ঋণসংস্থার সাথে পৃথক দুটি লেন-দেন (ট্রাঞ্জেকশন) করবে, ব্যাংক বা ঋণসংস্থাকে তার প্রতিনিধি নিয়োগ দিবে। তারা প্রতিনিধি হিসাবে ইম্পোর্টার থেকে টাকা আদায় করে এর জন্য সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করবে।

* এরপর ব্যাংক এলসি'র কম পরিমাণ টাকা এক্সপোর্টারকে বিনা সুদে ঋণ দিবে।

যেমন : বিক্রেতা এক লক্ষ টাকার বিল ডিসকাউন্টিং করার লক্ষে ব্যাংক বা ঋণ সংস্থাকে এজেন্ট নিয়োগ দিবে, তারা টাকা উত্তোলন করে এক্সপোর্টারকে পঁচানব্বই হাজর টাকা দিবে বাকী পাঁচ হাজর টাকা সার্ভিস চার্জ হিসাবে গ্রহণ করবে।

অপরদিকে ব্যাংক তাকে পঁচানব্বই হাজার টাকা বিনা সুদে ঋণ দিবে, ইম্পোর্টার থেকে এক লক্ষ টাকা উত্তোলন করে পঁচানব্বই হাজার টাকা ঋণ পরিশোধ করে নিবে আর পাঁচ হাজার টাকা সার্ভিস চার্জ হিসাবে নিবে। এভাবে লেনদেনটি শরীয়তসম্মত হতে পারে।

উপরযুক্ত পদ্ধতিটি শরীয়তসম্মত হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যকীয় আরেকটি শর্ত হচ্ছে, সার্ভিস চার্জ বিল আদায়ের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারবে না। সার্ভিস চার্জ বিলের মেচুরিটি পিরিয়ডের সাথে রিলেটেড নয়। যেমন বিল আদায়ে তিন মাস লাগলে চার হাজার আর চার মাস লাগলে ছয় হাজার টাকা এরূপ হলে বিল ডিসকাউন্টিং শরীয়তসম্মত থাকবে না সুদী লেনদেন হয়ে যাবে।

ফরেন এক্সচেঞ্জের অগ্রীম ব্যাংকিং

ফরেন এক্সচেঞ্জ অগ্রীম ব্যাংক করানো জায়েজ কিনা? এ মাসআলাটি পরিষ্কারভাবে বুঝার জন্য কারেন্সি বেচাকেনার কিছু মূলনীতি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। সে মূলনীতিগুলো মাসআলা বুঝার জন্য সহায়ক হবে।

কারেন্সি (মুদ্রা) বেচাকেনার মূলনীতি

কারেন্সি পরিবর্তন শরীয়তসম্মত। কারেন্সির মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিজেদের সম্মতিই যথেষ্ট।

নিজেদের নির্ধারিত মূল্যই প্রযোজ্য। যদি কোন দেশে মুদ্রা বেচাকেনার জন্য সরকারিভাবে মুদ্রার কোন মূল্য নির্ধারণ করা থাকে খোলা বাজারে বিক্রির অনুমতি না থাকে, সে দেশে সরকারি মূল্যের বাইরে বিক্রি করা নিষিদ্ধ থাকে, সে সমস্ত দেশে সরকারি নির্ধারিত মূল্যের বাইরে মুদ্রা বেচাকেনা করা যাবে না। কারণ দেশের আইন শরীয়ত বিরোধী না হলে প্রতিটি নাগরিকের মান্য করা ওয়াজিব। সে অনুপাতে সরকারি নির্ধারিত মূল্যের কম বেশি করা শরীয়ত বিরোধী। এরূপ শরীয়ত নিষেধ করে তবে সুদের অপরাধে নিষিদ্ধ নয়। আর সরকারিভাবে ওপেন মার্কেটে (খোলা বাজারে) মুদ্রা বিক্রির অনুমতি থাকলে পরস্পরে সম্মতিতে মূল্য নির্ধারণ করতে পারবে। এতে কোন আপত্তি নেই। যেমন, বাংলাদেশে ডলারের মূল্য ৬০ টাকা নির্ধারিত। দুজনের সম্মতিতে যদি একষট্টি টাকায় ডলার বেচাকেনা হয় সে বেচাকেনা বৈধ তবে সরকারি আইনের পরিপন্থী হওয়ার কারণে তাদের বেচাকেনা 'মাকরূহ' অপছন্দনীয় হবে। তবে তাদের কারবারকে সুদী বলা যাবে না।

২য় মূলনীতি : কারেন্সি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে লেনদেনের মুহূর্তে কোন একপক্ষকে অবশ্যই মুদ্রা কবজা করতে হবে। অপর পক্ষ পরে কবজা করলেও কোন ক্ষতি নেই।

৩য় মূলনীতি : কারেন্সি পরিবর্তনের সময় একজন নগদ গ্রহণ করল অপরজন তারিখ নির্ধারণ করল তবে সেক্ষেত্রে কারেন্সি মূল্য বাজার দর থেকে কম বেশি হতে পারবে না। যেমন, এক হাজার টাকার ডলার অমুক তারিখে দিতে বলা হলে ডলারের মূল্য বাজার দর থেকে কম বেশি হতে পারবে না। কম বেশি হলে সুদের দরোজা খুলে যাওয়ায় নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। যেমন, এক হাজার রূপিতে তেত্রিশ ডলার পাওয়া যায় কিন্তু তারা পরস্পরে চল্লিশ ডলার লেনদেনে সম্মত হয়ে কারবার করলে এতে সুদের দরোজা খুলে যাওয়ায় নিষিদ্ধ হবে। এসব মূলনীতি পূর্ণ বিক্রির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এগ্রিমেন্ট টু সেলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যদি নির্দিষ্ট তারিখে ডলার ভাঙ্গানোর চুক্তি করে উপস্থিত আদান প্রদান না হয়, তবে তারা পরস্পর ইচ্ছানুযায়ী ডলারের মূল্য নির্ধারণ করতে পারে। পূর্ণ বিক্রির পর যদি এক পক্ষ নগদ গ্রহণ করে অপর পক্ষ তারিখ নির্ধারণ করে তবে তারা বাজার দরের কম বেশি করতে পারবে না। কম বেশি করলেই নাজায়েজের মধ্যে গণ্য হবে।
এগ্রিমেন্ট টু সেলের সময় দুজনে ইচ্ছানুযায়ী ডলারের মূল্য নির্ধারণ করতে পারবে। তবে এর জন্য কোন ফি দাবি করতে পারবে না, নির্দিষ্ট তারিখে আদায় করতে পারে বা না পারে সর্বাবস্থায় ফি প্রদান করতে হবে না, এ ফি গ্রহণ সম্পূর্ণ অবৈধ।

অনুবাদ : মুহাম্মদ শফীকুল ইসলাম গওহরী

জীবনের বিরুদ্ধে অপরাধ : আল কুরআনের বিধান

মুঃ শওকত আলী

খুন

১। কোন প্রাণ যাকে আল্লাহ সম্মানীয় করেছেন, ধ্বংস করবে না, অবশ্য সত্য ও ন্যায় সহকারে। এসব কথা যা পালনের জন্য তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা বুঝে শুনে কাজ করবে। (সূরা আন্‌আম-১৫১)

২। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে, তার অলিকে আমরা কেসাস দাবি করার অধিকার দান করেছি। অতএব সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমা লংঘন না করে। তার সাহায্য অবশ্যই করা হবে। (সূরা বনী ইসরাইল-৩৩)

কেসাস

১। হে ঈমানদারগণ, তোমাদের জন্য নর হত্যার ব্যাপারে কেসাসের আইন লিখে দেয়া হয়েছে। মুক্ত স্বাধীন ব্যক্তি তাকে হত্যা করলে তাকে হত্যা করেই কেসাস নেয়া হবে। হত্যাকারী কৃতদাস হলে, এ হত্যার বিনিময়ে তাকেই হত্যা করা হবে। কোন নারী অপরাধ করলে তাকে হত্যা করে কেসাস নেয়া হবে।

২। অবশ্য কোন হত্যাকারীর প্রতি তার (নিহতের) ভাই যদি কিছু নম্র ব্যবহার করতে প্রস্তুত হয় তবে প্রচলিত ন্যায় নীতি অনুযায়ী রক্তপাতের ক্ষতি বিধান হওয়া আবশ্যক এবং নিষ্ঠা ও সততার সাথে রক্তপাতের বিনিময় আদায় করা হত্যাকারীর অবশ্য কর্তব্য। এটা তোমাদের রব-এর তরফ হতে দণ্ডহ্রাস ও অনুগ্রহমাত্র।

৩। এ অনুগ্রহের পরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করবে তার জন্য কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। (সূরা বাকারা- ১৭৮)

কেসাসেই জীবন নিহিত

বুদ্ধি বিবেক সম্পন্ন হে মানুষ কেসাসেই তোমাদের জীবন নিহিত রয়েছে। আশা করা যায় যে তোমরা এ আইন লংঘন হতে বিরত থাকবে (আল্লাহর ভয়ে)। (সূরা বাকারা আয়াত- ১৭৯)

লেখক : বোর্ড সেক্রেটারী, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, জয়েন্ট সেক্রেটারী, ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ।

নর হত্যা

১। কোন মোমিন ব্যক্তিকে হত্যা করা কোন ঈমানদার ব্যক্তির কাজ হতে পারে না; অবশ্য ভুলভ্রান্তি হতে পারে। যে ব্যক্তি কোন মোমিন ব্যক্তিকে ভুলবশত হত্যা করবে তার কাফফারা স্বরূপ এক মোমিন ব্যক্তকে গোলামী হতে মুক্ত করতে হবে এবং নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদিগকে রক্তমূল্য দিতে হবে। রক্তমূল্য মাফ করে দিলে সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু নিহত মুসলিম ব্যক্তি যদি তোমাদের শত্রু জাতের মধ্য হতে হয়ে থাকে তবে এর কাফফারা হচ্ছে একজন মোমিন গোলামকে মুক্ত করা। পক্ষান্তরে সে যদি এমন কোন অমুসলিম হয়ে থাকে যার সাথে তোমাদের সন্ধি চুক্তি রয়েছে তবে তার উত্তরাধিকারীদেরকে রক্ত বিনিময় দিতে হবে এবং একজন মোমিন গোলামকে আজাদ করতে হবে। আর যে কোন গোলাম পাবে না সে ক্রমাগত দু'মাস পর্যন্ত রোযা রাখবে। এ ধরনের গুনাহ হতে আল্লাহর নিকট তওবা করার এটাই হচ্ছে রীতি। আল্লাহ সর্বজ্ঞ বুদ্ধিমান।

২। তার পরে যে ব্যক্তি কোন মেমিন ব্যক্তিকে জেনে বুঝে হত্যা করবে তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম। তাতে সে চিরদিন থাকবে। তার উপর আল্লাহর গজব ও অভিশাপ। আল্লাহ তার জন্য কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। (সূরা নিসা- ৯২, ৯৩)

লেখা আহ্বান

এই পত্রিকায় ইসলামী আইন ও বিচার সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের তথ্যভিত্তিক ও গবেষণাধর্মী লেখা এবং সাময়িক প্রসঙ্গ স্থান পাবে যেমন-

১. ইসলামী আইনের ইতিহাস
২. বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন শাসনামলে ইসলামী বিচার ব্যবস্থার স্বরূপ
৩. ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইনের তুলনামূলক পর্যালোচনা
৪. ইসলামে অর্থনৈতিক, শ্রমনৈতিক, সামাজিক ও নারী অধিকার সংক্রান্ত বিধান
৫. বর্তমান যুগে মুসলিম দেশসমূহে শরীয়াহ আইন প্রবর্তনের প্রচেষ্টা ও প্রয়োজনীয়তা
৬. ইসলামী আইন ও মানবাধিকার
৭. যুগে যুগে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও ইসলামী আইন
৮. গণতন্ত্র ও ইসলাম
৯. ইসলাম ও রাষ্ট্রীয় সামাজিক সন্ত্রাস ইত্যাদি। লেখার সাথে লেখকের পরিচিতি লিখে পাঠানোকেও গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হবে। লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় হতে হবে। অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা :
সম্পাদক
ইসলামী আইন ও বিচার
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
পিসি কালচার ভবন (৪র্থ তলা) ১৪, শ্যামলী
শ্যামলী বাসষ্ট্যান্ড, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩১৭০৫, মোবাইল : ০১৭১-৩৪৫০৪২
E-mail :ilrclab@yahoo.com

আপনাদের প্রশ্নের জবাব

ইসলামী আইন ও বিচার এর পাতায় ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা, ইসলামী শরীয়ত এবং দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিভিন্ন ও বিচিত্র সমস্যাবলী সংক্রান্ত প্রশ্ন আহ্বান করা হচ্ছে।

দৃষ্টি আকর্ষণ

বছরে ৪টি সংখ্যা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। গ্রাহক ও এজেন্টগণ যোগাযোগ করুন। নিয়মিত গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়।

পাঠকের মতামত

সম্মানিত পাঠকদের মূল্যবান মতামত আমরা গুরুত্বসহকারে ছাপিয়ে থাকি।

ইসলামী আইন ও বিচার-এর এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

- ❖ ৫ কপির কম এজেন্ট করা হয় না।
- ❖ বছরের যে কোনো সময় এজেন্ট হওয়া যাবে।
- ❖ পত্রিকার মূল্য অগ্রিম পাঠাতে হয় না। পোস্ট অফিস থেকে ভিপিপি প্যাকেট বুঝে নিয়ে টাকা পরিশোধ করতে হয়।
- ❖ এজেন্টগণকে প্রথমবারের মতো এজেন্সি ফি বাবদ ৫০.০০ (অফেরতযোগ্য) জমা দিতে হবে।
- ❖ ভিপিপিযোগে পত্রিকা পাঠানো হয়। ভিপিপি গ্রহণ না করে ফেরত পাঠালে পত্রিকা আর পাঠানো হবে না।

কমিশনের হার

৫-২০ কপি = ৩০% ২০ কপির বেশি হলে ৪০% কমিশন প্রদান করা হবে।

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

- ❖ বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
- ❖ গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফট অথবা সরাসরি জমা দিলে পত্রিকা পাঠানো হয়।
- ❖ রেজিস্ট্রি ডাক ছাড়া সাধারণ ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

গ্রাহক চাঁদার হার

দেশ	ষান্মাষিক (২ সংখ্যা)	বার্ষিক (৪ সংখ্যা)
বাংলাদেশ	৭০ টাকা	১৪০ টাকা
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল	২১০ টাকা	৪২০ টাকা
সউদী আরব, কুয়েত, ওমান, কাতার	২৮০ টাকা	৫৬০ টাকা
ইরান, ইরাকসহ এশীয় দেতশসমূহ	৩৫০ টাকা	৭০০ টাকা
ইউরোপ ও আফ্রিকার দেশসমূহ	৮০০ টাকা	১৬০০ টাকা
উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও ওশেনীয় মহাদেশের দেশসমূহ	৯০০ টাকা	১৮০০ টাকা

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
পিসি কালচার ভবন, ১৪ শ্যামলী, শ্যামলী বাসষ্ট্যান্ড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ফোন- ৯১৩১৭০৫, মোবাইল : ০১৭১-৩৪৫০৪২
E-mail :ilrclab@yahoo.com

ইসলামী আইন ও বিচার
গ্রাহক/এজেন্ট ফরম

আমি 'ইসলামী আইন ও বিচার' এর গ্রাহক / এজেন্ট হতে চাই

☐ আমার জন্য ☐ প্রতিষ্ঠানের জন্য ☐ বছরের জন্য ☐ কপি প্রতি সংখ্যা

নাম ....

পদবী ....

পেশা ....

প্রতিষ্ঠানের নাম ....

ঠিকানা...

.... ফোন/মোবাইলঃ..

গ্রাহক পত্রের সঙ্গে.......................................টাকা নগদ/মানি অর্ডার করুন।

কথায় (...)।

স্বাক্ষর
ম্যানেজার

স্বাক্ষর

৫ কপির কমে এজেন্ট করা হয় না, ৫ কপি থেকে ২০ কপি পর্যন্ত ৩০% কমিশন
২০ কপির উর্ধে ৪০% কমিশন

=> ১ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(চার সংখ্যা) =৩৫৪=১৪০/=

=> ২ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(আট সংখ্যা) =৩৫৮=২৮০-১০=২৭০/=

=> ৩ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(বার সংখ্যা =৩৫ ১২=৪২০-২০=৪০০/=

গ্রাহক ফরমটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

সম্পাদক

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

পিসি কালচার ভবন, ১৪ শ্যামলী, শ্যামলী বাসষ্ট্যান্ড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

ফোন- ৯১৩১৭০৫, মোবাইল : ০১৭১-৩৪৫০৪২

E-mail :ilrclab@yahoo.com